শ্রীমা

ছোটদের গল্প



শ্রীমা

ছোটদের গল্প

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

ফরাসীভাষায় লিখিত Belles Histoires গ্রন্থের অনুবাদ
চিত্রকর : আশ্রমবাসী ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক উপেন্দ্র
অনুবাদক : শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত

প্রথম সংস্করণ ১৯৫১
নবম সংস্করণ ১৯৮৩
পুনর্মুদ্রিত : ১৯৬৮, ১৯৮৮

ISBN 81-7058-096-X

প্রকাশক : শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রকাশন বিভাগ, পণ্ডিচেরী
মুদ্রক : শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী

মায়ের বাণী

Ces histoires ont été écrites pour aider les enfants à se trouver eux-mêmes et à suivre un chemin de rectitude et de beauté.

Février 1950.

এই গল্পগুলি লেখা হয়েছিল যাতে এর থেকে ছোটরা নিজেরাই নিজেদের আবিষ্কার করতে পারে, চলতে পারে সত্য ও সৌন্দর্যের পথে।

ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ —শ্রীমা

সূচীপত্র

আত্ম-সংযম

বন্য ঘোড়াকে পোষ মানাতে পারা যায় কিন্তু বাঘের মুখে কখনো লাগাম দেওয়া যায় না।

কেন এ রকম হয়? কারণ বাঘের মধ্যে এমন একটা নিষ্ঠুর এবং বেয়াড়া অপশক্তি রয়েছে যার জন্য তার কাছ থেকে ভাল কিছুই আমরা আশা করতে পারি না। তাই বাধ্য হয়েই যাতে অনিষ্ট করতে না পারে সেজন্য তাকে আমরা মেরে ফেলি।

কিন্তু বন্য ঘোড়া প্রথম প্রথম যতই অবাধ্য এবং দুরন্ত হোক, একটু কেবল চেষ্টা এবং সহিষ্ণুতা থাকলেই তাকে বশে আনা যায়। ক্রমে তারা আমাদের বাধ্য হয়, এমনকি ভালবাসতে পর্যন্ত শেখে। অবশেষে নিজেই মুখ বাড়িয়ে লাগাম পরতে চায়।

মানুষের মধ্যেও এইরকম বিদ্রোহী ও উদ্ধত বাসনা এবং প্রবৃত্তি রয়েছে, কিন্তু এমন খুবই কম দেখা যায় যেখানে তারা বাঘের মত অদম্য হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা বন্য ঘোড়ার মত। তাই তাদের সংযত করে রাখার জন্য দরকার লাগামের। আর সেটাই হল সবচেয়ে ভাল লাগাম যা মানুষ নিজেই নিজেকে পরাতে পারে। এরই নাম আত্মসংযম।

*

* *

হুসেন পয়গম্বর মহম্মদের পৌত্র। তার সুন্দর বাড়ি, অগাধ টাকাকড়ি। তার মানের হানি করা অর্থ বড়লোকের মানহানি করা। ধনীর ক্রোধ দারুণ দুঃসহ।

একদিন হুসেন খেতে বসেছেন। একজন চাকর একটি পাত্রে ফুটন্ত জল নিয়ে তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কপালদোষে পড়বি তো পড় একটুখানি জল একেবারে পয়গম্বরের নাতির গায়ে গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রেগেমেগে ভীষণ চীৎকার করে উঠলেন।

চাকরটি নতজানু হয়ে বসল। উপস্থিত-বুদ্ধির দৌলতে সময়মত কোরাণের একটি বাণী তার মনে পড়ে গেল :

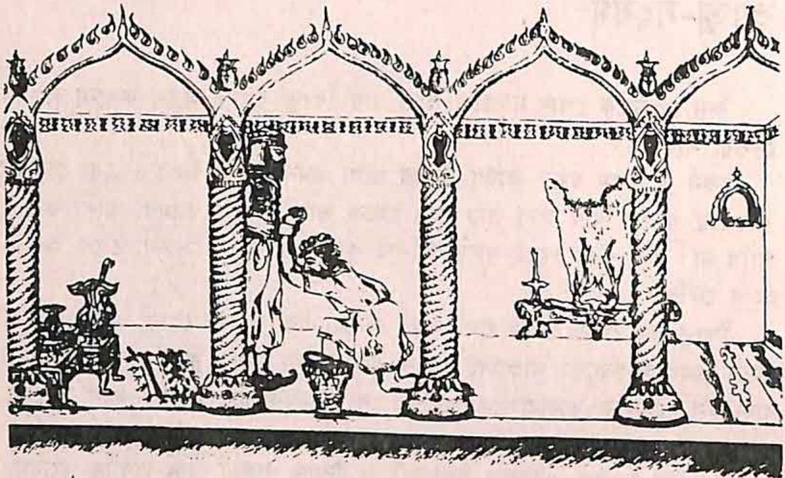
—"স্বর্গ তাদেরই জন্য যারা রাগকে লাগাম দিয়ে সংযত করতে পেরেছে," সে বলল।

—"আমি রাগ করিনি," কথাগুলির মর্ম বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন হুসেন।

—"আর যারা মানুষকে ক্ষমা করে তাঁদের জন্যেও," যোগ করে ভৃত্যটি।

—"আমি তোমায় ক্ষমা করলাম," হুসেন বললেন।

—"কেন না যারা সদয়-হৃদয় আল্লা তাদের ভালবাসেন," দাসটি আরো বলল।



এইরকম কথাবার্তা হতে হতে হুসেনের সব রাগ চলে গেল। হৃদয় এতখানি নরম হয়ে গেল যে তিনি চাকরকে ধরে তুললেন ও বললেন :

—"এখন থেকে তুমি মুক্ত। এস, এই চারশত রৌপ্যমুদ্রা নাও।"

এমনিভাবে হুসেন তাঁর উদার অথচ আবেগমত্ত মনকে লাগাম পরিয়েছিলেন। তাঁর মহান চরিত্র দূষিত বা নিষ্ঠুর ছিল না, তাই সংযমশিক্ষা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

*

* *

তোমাদের পিতামাতা কিংবা ধরো কোনো শিক্ষকই যদি কখনো তোমাদের স্বভাব সংযত করতে বলেন, তার অর্থ এই ভেবো যে তাঁরা মনে করেন তোমাদের ভুল-ত্রুটির, সে-সব ছোট হোক আর বড়ই হোক, সংশোধন হতে পারে। আর তাঁরা জানেন যে তরুণ তেজস্বী ঘোড়ার মত তোমাদের চঞ্চল এবং উদ্ধত মনকে রাশ দিয়ে টেনে রাখা উচিত।

তোমাদের বাস করবার জন্য কেউ যদি একটা অপরিচ্ছন্ন কুঁড়েঘর আর একটা রাজপ্রাসাদ দিতে চায়, কোনটি তোমরা বেছে নেবে? নিশ্চয়ই রাজপ্রাসাদটি।

তবে শোন।

গল্প আছে, হজরত মহম্মদ যখন স্বর্গে ঘুরেফিরে দেখছিলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন ঊর্ধ্বলোকে চারিদিক ছেয়ে বিরাট সব প্রাসাদ নির্মাণ করা রয়েছে।

—"দেবদূতশ্রেষ্ঠ!" যে-দেবদূতটি মহম্মদকে সব দেখাচ্ছিল তাঁকে তিনি বললেন, "এই প্রাসাদগুলি কাদের জন্য?"

—"যাঁরা ক্রোধ জয় করেছেন এবং অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন তাঁদের জন্য," বললেন দেবদূত।

বটেই তো, দ্বেষশূন্য শান্ত স্নিগ্ধ মন সত্যিকারের একটা প্রাসাদেরই মত। কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ উচ্ছল-উচ্ছৃংখল মন ও-ধরনের জিনিস আদৌ নয়। আমাদের চিন্তা যেন একটা বাড়ি, তাকে আমরা আমাদের পছন্দমত নির্মল, শান্ত, স্নিগ্ধ এবং স্বচ্ছন্দ সুরতরঙ্গে ভরে তুলতে পারি; কিন্তু তেমনি আবার সেটিকে একটা কর্কশ শব্দ আর শোকাতুর আর্তনাদে পরিপূর্ণ, ভীষণ অন্ধকার আবাসে পরিণত করতে পারি।

*

* *

ফ্রান্সের উত্তরে অবস্থিত কোনো গ্রামের একটি বালকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। অকপট তার মন কিন্তু হৃদয় আবেগে ভরা। একটুতেই দেয় নিজেকে ভাসিয়ে।

—"তোমার কি মনে হয়, তোমার মতন শক্তিমান ছেলের পক্ষে কোন্‌টি করা বেশি শক্ত, যদি তোমার বন্ধু কখনো তোমায় আঘাত করে তখন তাকে ফিরে আঘাত করা, না ঠিক সেই মুহূর্তে হাত দুটো পকেটে ভরে রাখা?" আমি তাকে একদিন বললাম।

—"পকেটে ভরে রাখা।" সে উত্তর দিল।

—"আর তোমার মত বীর ছেলের পক্ষে কোন্‌টি বেশি মানের কাজ হবে, যেটি সবচেয়ে সহজ সেইটি করা না যেটি সবচেয়ে বেশি শক্ত?"

—"সবচেয়ে শক্ত যেটা", এক মিনিট ইতস্তত করে সে বলল।

—"তা হলে পরের বারে যখন সুযোগ আসবে তখন সেটি করতে চেষ্টা ক'রো।"

কিছুদিন পরে সেই তরুণ বালকটি একদিন এসে আমায় বলল, তাতে যে বেশ একটু ন্যায়সংগত গর্বের ভাব ছিল না তা নয়, সে 'সবচেয়ে কঠিন কাজটি' করতে পেরেছে।

সে বলল—"কারখানার এক বন্ধু। তাকে সবাই বদ স্বভাবের বলে জানে। একদিন হঠাৎ রাগের মাথায় সে আমায় মেরে বসল। তারপর যেই তার মনে হল যে সাধারণতঃ ক্ষমা করা আমার ধাতে নেই, তাছাড়া আমার রয়েছে দুটি সবল বাহু, অমনি আত্মরক্ষার জন্য তৈরী হতে লাগল। ঠিক তখন আপনার উপদেশ মনে পড়ল। ব্যাপারটা যত ভাবিনি তার চেয়েও শক্ত বোধ হল। তবু হাত দুটো পকেটেই ভরে রেখেছিলাম। ওরকম করা তৎক্ষণাৎ মনে হল আমার আর একটুও রাগ নেই। শুধু বন্ধুটির ওপর দয়া হতে লাগল। তারপর তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। এতে সে এত অবাক হল যে খানিকক্ষণ হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বেরুল না। পরে আমার

হাতের ওপর ঝুঁকে পড়ে, তা বেশ জোরের সঙ্গে চেপে ধরে বিচলিত কণ্ঠে বলল, "এখন তুমি আমাকে দিয়ে যা খুশি করাতে পার। আমি তোমার চির-দিনের বন্ধু হলাম।"

খলিফা হুসেন যেমন ক্রোধ জয় করতে শিখেছিলেন এই ছেলেটিও তেমনি তার ক্রোধ জয় করেছিল।

এ ছাড়াও আরো অনেক জিনিস রয়েছে, তাদের জন্যও লাগাম দরকার।

*

*   *

আরবদেশের কবি অল্ কোশাই মরুভূমিতে বাস করতেন। একদিন তিনি একটি সুন্দর নাবাগাছ দেখতে পেয়ে তার ডাল দিয়ে একটা ধনুক আর কিছু তীর বানালেন।

রাত্রিকালে তিনি বন্য গর্দভের সন্ধানে বের হলেন। একটু পরেই একদল বুনো জানোয়ারের খুরের শব্দ তাঁর কানে এল। তিনি প্রথম তীর ছুঁড়লেন। কিন্তু ধনুক এত জোরে টেনেছিলেন যে তীরটি একটা জানোয়ারের গা ভেদ করে পাশের এক পাথরে গিয়ে সশব্দে লাগল। পাথরের এই শব্দ শুনে অল্ কোশাই ভাবলেন তাঁর লক্ষ্য ভুল হয়েছে। তিনি দ্বিতীয় তীর ছুঁড়লেন। এবারেও তা একটা গাধাকে ভেদ করে পাথরে গিয়ে লাগল। অল্ কোশাই ভাবলেন, আবার তিনি লক্ষ্যচ্যুত হয়েছেন। ক্রমে ক্রমে তিনি তাঁর তৃতীয়, চতুর্থ



ও পঞ্চম তীর নিক্ষেপ করলেন এবং প্রত্যেক বারই সেই শব্দ শুনতে পেলেন। পঞ্চম বার রাগ করে ধনুকটি ভেঙেই ফেললেন।

সকাল হলে তিনি দেখতে পেলেন পাঁচটা গর্দভ পাথরের সামনে মাটির উপর পড়ে আছে।

যদি তাঁর আর একটু বেশি ধৈর্য থাকত, ভোর হওয়া পর্যন্ত যদি তিনি অপেক্ষা করতে পারতেন, তাহলে তাঁর মনের প্রশান্তি এবং ধনুক দুই-ই বজায় থাকত।

*

* *

তাই বলে এ-রকম ভাবা উচিত নয় যে সংযম বলতে আমরা বুঝি তেমন কিছু যা মানুষকে তার সব উৎসাহ উদ্দীপনা কেড়ে নিয়ে দুর্বল করে ফেলে। বন্য ঘোড়াকে যখন লাগাম দেওয়া হয় তার উদ্দেশ্য যে তাতে তার মুখ ছিঁড়ে যাক, দাঁত ভেঙে যাক, তা নয়। কেউ যদি তাকে দিয়ে সুষ্ঠুভাবে কাজ হাসিল করিয়ে নিতে চায় তবে তার উচিত হবে লাগাম দিয়ে ধরে তাকে চালিয়ে নেওয়া, যাতে সে আর এগুতে না পারে সেজন্য নিষ্ঠুরভাবে কষে টেনে ধরা নয়।

তবে দুঃখের কথা প্রায় ভেড়ার মত দুর্বল প্রকৃতির মানুষ অনেক আছে— তাদের চালাতে শুধু একটু মুখের শব্দই যথেষ্ট।

এমন দাস-প্রকৃতির মানুষ আছে যারা অনুভূতিহীন, উৎসাহবিহীন, অতি-মাত্রায় পরানুগত।

*

* *

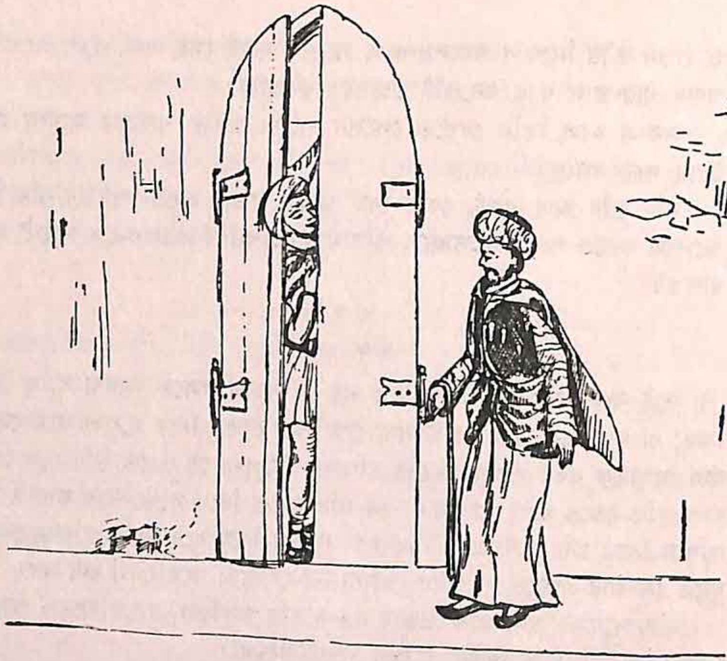
আবু ওতমান অল্ হিরি তাঁর অসীম ধৈর্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। একদিন এক উৎসবে তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হল। তিনি এলে গৃহস্বামী তাঁকে বললেন, "মাপ করবেন, আপনাকে অভ্যর্থনা করে আসন দিতে আমি অপারগ। তাই অনুরোধ করছি ফিরে যান। আল্লার করুণা আপনার ওপর বর্ষিত হোক।"

আবু ওতমান স্বগৃহে ফিরে এলেন। ফিরতে না ফিরতেই আবার বন্ধুটি এসে তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন।

আবু ওতমান বন্ধুর সঙ্গে তাঁর গৃহের দরজা পর্যন্ত গেলেন। সেখানে বন্ধুটি থামলেন এবং আবার অসামর্থ্য জানিয়ে মাপ চাইলেন। আবু ওতমান কোনো প্রতিবাদ না করে নিঃশব্দে ফিরে এলেন।

তৃতীয় বার, তারপর চতুর্থ বার এই একই ব্যাপার ঘটল। অবশেষে বন্ধুটি তাঁকে স্বাগত করে নিলেন এবং সকলের সামনে বললেন :

—"আবু ওতমান, আমি তোমার মহান চরিত্র পরীক্ষা করবার জন্য ওই রকম ব্যবহার করেছিলাম। আমি তোমার ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার ভূয়সী প্রশংসা করছি।"



—"আমায় প্রশংসা ক'রো না," আবু ওতমান প্রত্যুত্তরে বললেন, "কারণ কুকুররাও ওই গুণের পরিচয় দিয়ে থাকে; তারাও ডাকলে আসে এবং তাড়িয়ে দিলে চলে যায়।"

আবু ওতমান মানুষ, তিনি কুকুর নন। কিন্তু ঔচিত্যবোধ এবং আত্ম-মর্যাদাবোধ হারিয়ে স্বেচ্ছায় বন্ধুদের কাছে হাস্যাস্পদ হওয়ায় তিনি কারও কিছুমাত্র উপকার করতে পারলেন না।

এত বিনম্র লোকটির মধ্যে সংযত করবার মত কিছুই কি ছিল না? ছিল বৈ কি! যা সংযত করা সবচেয়ে কঠিন তা-ই ছিল। সেটি চরিত্রের দুর্বলতা। এবং যেহেতু নিজের ওপর তাঁর শাসন ছিল না, তাই সকলেই তাঁকে নিজের মত শাসন করে চলেছে।

*

* *

এক তরুণ ব্রহ্মচারীর অনেক গুণ ছিল। এ-সম্বন্ধে সে বেশ সচেতন। তার ইচ্ছা হল সে-সব গুণ আরও বাড়ুক, সর্বত্র প্রশংসা লাভ করুক। তাই দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করতে বের হল।

এক তীরনির্মাতার কাছে সে তীর বানাতে শিখল।

আর এক জায়গায় নৌকা বানাতে এবং চালাতে শিখল।

অন্যত্র গৃহ নির্মাণ করতে শিখল।

আরও নানা জায়গায় নানারকম বিদ্যা সঞ্চয় করল।

এমনি করে ষোলটি দেশ সে পরিভ্রমণ করল। তারপর স্বগৃহে ফিরে বুক ফুলিয়ে বলতে লাগল, "পৃথিবীতে আমার মত যোগ্যতা আর কার আছে?"

ভগবান বুদ্ধ তাকে দেখে সবচেয়ে বড় যে-বিদ্যা সে এখনো শেখেনি তাই শেখাতে ইচ্ছা করলেন। এক বৃদ্ধ শ্রমণের বেশে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে যুবকের সম্মুখে তিনি উপস্থিত হলেন।

—"তুমি কে?" ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করল।

—"শরীরকে শাসন করতে পারি এমন মানুষ আমি।"

—"তার অর্থ?"

—"ধানুকী তীর ছুঁড়তে জানে, নাবিক নৌকা চালায়, স্থপতি অট্টালিকা-নির্মাণ পরিচালনা করে, কিন্তু জ্ঞানী আপনাকে শাসন করেন," বললেন বুদ্ধ।

—"কি করে?"

—"প্রশংসায় তাঁর মন চঞ্চল হয় না; আবার নিন্দায়ও তাঁর মন কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। নিজেকে তিনি ধর্মের পথে নিয়ে চলেন এবং শান্তির মধ্যে বাস করেন।"

সুমতি বালকবালিকারা, তোমরাও নিজেকে নিজেরা চালাতে শেখ। আর তোমাদের স্বভাব নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য যদি কঠিন লাগামেরই প্রয়োজন থাকে তো তার জন্য নালিশ ক'রো না।

অসংযত তরুণ অশ্ব হওয়া বরং অনেক ভালো, একটু একটু করে সে সুশীল হয়ে উঠবে কিন্তু অসাড় কাঠের ঘোড়া, যাই কর না কেন, বরাবর যেমন তেমনই থেকে যাবে। তার মুখে লাগাম দিতে যাওয়া শুধু তামাশার জন্য।

সাহস

জলের মধ্যে পড়ে গিয়েছ তুমি। বিপুল জলরাশি তবু তোমায় ভীত করতে পারে না। তুমি হাত পা চালাতে আরম্ভ কর, কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ কর যে তোমায় সাঁতার শিখিয়েছে। ঢেউগুলির সঙ্গে লড়তে থাক তুমি। তুমি বেঁচে ফিরে এলে। সাহস দেখালে বটে।

ঘুমিয়ে ছিলে তুমি। ওই আগুন! ভীত চীৎকার শুনে জেগে উঠলে। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে দেখতে পাও আগুনের লাল ফুলকির রঙ। তুমি একটুও ভয় পেলে না। ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে, ফুলকির ভেতর দিয়ে, অগ্নি-শিখার ভেতর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলে। এও সাহস।

কিছুকাল পূর্বে আমি বিলেতের একটি শিশুবিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। বিদ্যার্থীদের বয়স তিন থেকে সাত বছরের মধ্যে। তাদের মধ্যে ছেলে এবং মেয়ে দুই-ই রয়েছে। তারা কেউ সেলাই করছে, কেউ ছবি আঁকছে, কেউ গল্প শুনছে, কেউ-বা গান গাইছে।

অধ্যাপকটি আমায় বললেন : "আমরা আগুন লাগানর ঘণ্টা বাজিয়ে দিতে যাচ্ছি। বলা বাহুল্য সত্যি সত্যি কোথাও কিন্তু আগুন লাগেনি। তবে ছেলে-মেয়েদের শেখাতে হয়েছে সঙ্কেত-ঘণ্টা বাজলে কিভাবে চট্ করে বেরিয়ে আসতে হবে।"

তিনি বাঁশিতে ফুঁ দিলেন। সেই মুহূর্তে ছাত্রছাত্রীরা তাদের বই, পেনসিল, সেলাইয়ের ছুঁচ নামিয়ে রেখে দাঁড়াল। আর একবার বাজাতে তারা পর পর সার বেঁধে খোলা জায়গার বাইরে বেরিয়ে এল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘর একদম ফাঁকা। এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আগুনের বিপদের সম্মুখীন এবং নির্ভীক হতে শিখেছে।

কার রক্ষার জন্য সাঁতার কেটেছিলে তুমি? তোমার নিজের।

কার রক্ষার জন্য আগুন পার হয়ে এলে তুমি? তোমার নিজের।

কার রক্ষার জন্য বালক-বালিকারা আগুনের ভীতিকে বাধা দেবে? তাদের নিজেদের।

এই যে সাহসের দৃষ্টান্ত সব, এর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ছিল নিজের নিজের আত্মরক্ষার প্রেরণা। এটা কি মন্দ? নিশ্চয়ই না। এ তো উচিতই যে প্রত্যেকে নিজের জীবনের যত্ন করবে, তাকে রক্ষা করবার জন্য সাহস দেখাবে। তবে এর চেয়ে বড় এক রকমের সাহস আছে, যা নিযুক্ত হয় অপরের রক্ষায়।

*

*   *

আমি তোমাদের ভবভূতি-লিখিত মাধবের গল্প বলছি, শোন।

একদিন এক মন্দিরের বহির্ভাগে নতজানু হয়ে বসে রয়েছে সে, এমন সময়ে বিপন্নের একটা আর্তকণ্ঠ কানে এল।

ভেতরে যাবার পথ আবিষ্কার করে গর্ভগৃহে গিয়ে সে দেখতে পেল দেবী চামুণ্ডার বেদী।

এই ভীষণা দেবীর পূজাকল্পে একটি প্রাণীকে বলি দেওয়া হচ্ছে। বেচারীর নাম মালতী। ঘুমের মধ্যে থেকে এই তরুণীটিকে টেনে আনা হয়েছে। তার কাছে পূজারী এবং পূজারিণী ছাড়া আর কেউ নেই। পূজারী খড়্গ উদ্যত করতেই মালতী তার প্রিয় মাধবকে স্মরণ করল :

—"মাধব! দেবতা আমার।

মৃত্যুর পরেও আমি যেন তোমার স্মৃতির মধ্যে বেঁচে থাকতে পারি।

ভালবাসা সুদীর্ঘ এবং স্নেহময় স্মৃতির সৌরভে ভরে দিয়েছে যাদের জীবন তাদের তো মৃত্যু নেই।"

চীৎকার করে বীর মাধব বলির কক্ষে এক লাফে প্রবেশ করল। পূজারীর সঙ্গে সে কী ভীষণ মৃত্যুপণ যুদ্ধ। মালতীর জীবন রক্ষা হল।

মাধব কার জন্য সাহস দেখিয়েছিল? নিজের জন্য যুদ্ধ করেছিল কি? হ্যাঁ। কিন্তু তার সাহসের মূলে সেটাই একমাত্র কারণ নয়। পরের জীবন রক্ষার জন্যও সে যুদ্ধ করেছিল। বিপন্নের আর্তকণ্ঠ শুনেছিল সে, তা-ই তার নিভৃত বীর-হৃদয় স্পর্শ করেছিল।

*

* *

যদি ভাল করে মনে কর, তোমরাও এমনি ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখে থাকবে। তোমরা নিশ্চয় দেখে থাকবে কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোক অথবা কোনো বালকের করুণ ক্রন্দন শুনতে পেয়ে কেউ ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করেছে।

এমনি ধারা বীরত্বের কথা তোমরা আরও নিশ্চয় খবরের কাগজে কিংবা ইতিহাসে পড়েছ। গল্প শুনে থাকবে, দমকলের লোকেরা জ্বলন্ত বাড়িঘর থেকে বিপন্নদের উদ্ধার করে, খনি-শ্রমিকরা গভীর ভূগর্ভের জলপ্লাবন কিংবা আগুন অথবা বিষাক্ত গ্যাস থেকে তাদের সহকর্মীদের টেনে আনে, ভূমিকম্পের সময়ে দেওয়াল চাপা পড়ার বিপদ মাথায় নিয়েও উদ্ধারকারী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দুর্বল রুগ্নদের উদ্ধার করে বাইরে আনে নতুবা ভগ্নস্তূপের তলায় তারা মরে পড়ে থাকত। আর যে-সব দেশবাসী তাদের জন্মস্থান, তাদের মাতৃভূমির রক্ষার জন্য ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কত আঘাত এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত সহ্য করে শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাদের কথাও তোমরা শুনেছ।

তাহলে আমরা দেখতে পাই, সাহস হতে পারে এক আত্মরক্ষার জন্য, আর না হয় পরের রক্ষার জন্য।

*

* *

আমি তোমাদের কাছে বীর বিভীষণের গল্প বলছি। তিনি এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন, সে বিপদ মৃত্যুর চেয়েও ভীষণ : তিনি রাজরোষের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং কেউ যা মুখে আনতে সাহস করেনি সেই সুপরামর্শ রাজাকে দিয়েছিলেন।

লঙ্কার রাজার নাম রাবণ। তাঁর দশটা মাথা।

রাবণ রামের স্ত্রী সীতাকে চুরি করে তার রথে একেবারে লঙ্কাদ্বীপে নিজের প্রাসাদে নিয়ে এল।

অনুপম ঐশ্বর্য সে-প্রাসাদের। যে বাগানে সে রাজনন্দিনী সীতাকে বন্দী করে রাখল তা অপূর্ব মনোরম। তবু তাঁর মনে দুঃখ; চোখের জলে দিন কাটে; আর কি কখনো প্রভু রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হবে!

ভগবান রামচন্দ্র কপিরাজ হনুমানের কাছ থেকে জানতে পেলেন কোথায় তাঁর পত্নী বন্দিনী হয়ে আছেন। ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং এক প্রকাণ্ড বীর সেনাদল নিয়ে বন্দিনীকে উদ্ধার করতে রওনা হলেন তিনি।

রাক্ষস রাবণ রামের আগমন-সংবাদ পেয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল।

সে দু'রকম পরামর্শ পেল। একদল খোসামুদে সভাসদ তার সিংহাসনের চারদিক ঘিরে ধরে বলল এসে :

—"সব ঠিক। হে রাবণরাজা, কোন ভয় নেই। আপনি দেবতাদের এবং অসুরদের পরাভূত করেছেন, রাম আর তার সাঙ্গোপাঙ্গ এই হনুমানের বানরকুলকে পরাস্ত করতে আপনার কোন কষ্ট হবে না।"

বাক্‌সর্বস্ব উপদেষ্টারা রাজার কাছ থেকে চলে যাওয়া মাত্র বিভীষণ প্রবেশ করলেন। নত হয়ে রাজার চরণচুম্বন করলেন, তারপর উঠে সিংহাসনের ডান দিকে বসলেন। বললেন, "হে ভ্রাতঃ, যদি সুখে শান্তিতে বাস করতে চান এবং সুরম্য লঙ্কার রাজসিংহাসন নির্বিঘ্ন রাখতে চান তবে সুদর্শনা সীতাকে ফিরিয়ে দিন, কারণ তিনি পরস্ত্রী। রামের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করুন, তিনি বিমুখ হবেন না। আপনি উদ্ধত ও দুঃসাহসী হবেন না।"

মাল্যবান নামে একজন বিচক্ষণ লোক এই কথাগুলি শুনে সুখী হলেন। তিনিও সাগ্রহে রাক্ষসরাজকে বললেন :

—"আপনার ভ্রাতার উপদেশ গ্রহণ করুন, তিনি সত্য যা তা-ই বলেছেন।"

—"তোমাদের দু'জনারই কুমতলব দেখছি, তোমরা আমার শত্রুপক্ষ অবলম্বন করেছ," বললেন রাজা।

তাঁর দশটা মাথার চোখ রাগে আগুনের মত এমন জ্বলে উঠল যে মাল্যবান ভয়ে ঘর থেকে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু বিভীষণ তাঁর অন্তরাত্মার সাহসের বলে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—"রাজন্, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে রয়েছে সুবুদ্ধি আর দুর্বুদ্ধি। হৃদয়ে যখন সুবুদ্ধি বাস করে তখন জীবন হয় মঙ্গলময় শ্রেয়স্কর, আর তা না

হয়ে যদি সেখানে বাসা বাঁধে দুর্বুদ্ধি তবে সবই অমঙ্গলের। হে ভ্রাতঃ, আমার আশঙ্কা, দুর্বুদ্ধি আপনার বুকে আশ্রয় নিয়েছে, কারণ যারা কুপরামর্শ দিচ্ছে আপনি তাদের কথা শুনছেন : এরা আপনার সত্যিকারের বন্ধু নয়," তিনি বললেন।

এই বলে থেমে তিনি রাজার পদযুগল জড়িয়ে ধরতে রাবণ বলে উঠলেন, "হতভাগা! তুমিও দেখছি আমার শত্রুদের দলে। আর এরকম পাগলের মত কথা আমায় ব'ল না। বল গিয়ে বনে যেসব সন্ন্যাসী থাকে তাদের, কিন্তু যে-মানুষ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে একে একে, সর্বদা সর্বত্র জয়লাভ করেছে তাকে বলতে এস না।"

উগ্রকণ্ঠে এই বলে বীর ভ্রাতা বিভীষণকে তিনি এক পদাঘাত করলেন।

দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিভীষণ উঠে রাজার গৃহ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

ভয় তিনি কাকে বলে জানতেন না, তাই অকপটে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর কথা। দশানন সেকথা যখন শুনলেন না তখন বিভীষণের সেখান থেকে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় রইল না।

বিভীষণের এ হল শারীরিক সাহসের দৃষ্টান্ত, যেহেতু ভ্রাতার পদাঘাতকে তিনি ভয় করেননি। তথাপি কাজটি মানসিক সাহসেরও বটে, যেহেতু তাঁরই মত শারীরিক বল থাকা সত্ত্বেও অন্য সভাসদ্‌রা যেকথা মুখে উচ্চারণ করতে সাহস পাননি তিনি তা বিনা দ্বিধায় বলেছেন। এই মনের সাহসেরই নাম দেওয়া হয় নৈতিক সাহস।

*

* *

ইজরাইলের নেতা মুসা মিশর-রাজ ফারাও-র কবল থেকে নিপীড়িত ইহুদীদের মুক্ত করেছিলেন, তাঁর এই সাহস ছিল।

পয়গম্বর মহম্মদ তাঁর ধর্মজাত ভাব আরববাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, মৃত্যু-ভয়ে চুপ করে থাকেননি, তাঁরও এই সাহস ছিল।

ভগবান বুদ্ধ ভারতবাসীদের দিয়েছিলেন একটা অভিনব এবং মহান পথের সন্ধান, দুষ্ট শক্তিরা যখন তাঁকে বোধিবৃক্ষমূলে আক্রমণ করেছিল তখন তাতে ভয় পাননি তিনি, তাঁর এই সাহস ছিল।

যিশুখ্রীষ্টের এই সাহস ছিল, তিনি মানুষকে বলেছিলেন : "পরস্পরকে ভালবাস"। জেরুসালেমের বিচারকরা তাঁর বাণী প্রচার নিষেধ করেছিল, রোমানরা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, তাদের কারো ভয়ে তিনি ভীত হননি।

তাহলে আমরা তিন প্রকারের তিন স্তরের সাহসের উল্লেখ করতে পারি :

আত্মরক্ষার জন্য স্থূল শারীরিক সাহস।

আত্মীয় বন্ধু, বিপন্ন প্রতিবেশী, বিপদ্‌গ্রস্ত মাতৃভূমির জন্য সাহস।

শেষে হল নৈতিক সাহস যার বলে দাঁড়াতে পারি অন্যায়-অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে, যতই তারা শক্তিশালী হোক না, তাদের শোনাতে পারি ন্যায়ের এবং সত্যের বাণী।

*

* *

আলমুরা-রাজ তাঁর পর্বতসংকুল রাজ্য থেকে আক্রমণকারী শত্রুদের হটিয়ে দেওয়ার জন্য একটা নতুন বাহিনী গঠন করার উদ্দেশ্যে একদল লোক সংগ্রহ করে তাদের প্রত্যেককে একখানি করে তরোয়াল দিলেন।

রাজা আদেশ দিলেন, "এগিয়ে চল।"

তৎক্ষণাৎ সকলে খাপ থেকে ভীষণ শব্দে তরোয়াল বের করল এবং মহা চীৎকারের সঙ্গে সেগুলি আন্দোলিত করতে লাগল।

—"এসব করছ কেন?" রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

—"হুজুর, আমরা তৈরী হয়ে থাকছি যাতে শত্রুর হাতে হঠাৎ আক্রমণে বেকুব বনে না যাই," তারা বলল।

—"তোমাদের দিয়ে আমার কোনো কাজ হবে না, তোমরা দুর্বল-স্নায়ু এবং উত্তেজনাপ্রবণ। যে যার বাড়ী ফিরে যাও," রাজা তাদের বললেন।

তোমরা দেখলে, রাজা খোলা তরোয়াল আর বিপুল কোলাহলকে আদৌ আমল দিলেন না। তিনি জানতেন, যথার্থ সাহস আস্ফোট এবং আস্ফালনের উপর নির্ভর করে না।

*

* *

পরের ঘটনাতে দেখতে পাবে অন্য দৃষ্টান্ত, কি স্থির মস্তিষ্কে লোকেরা কাজ করছে এবং সমুদ্রের মারাত্মক বিপদের সম্মুখে কি বীরত্বের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল সবাই।

১৯১০ সালের মার্চ মাসের শেষাশেষি। একখানি স্কচ জাহাজ অস্ট্রেলিয়া থেকে যাত্রী নিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ যাচ্ছিল। আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। সমুদ্র নীল, শান্ত।

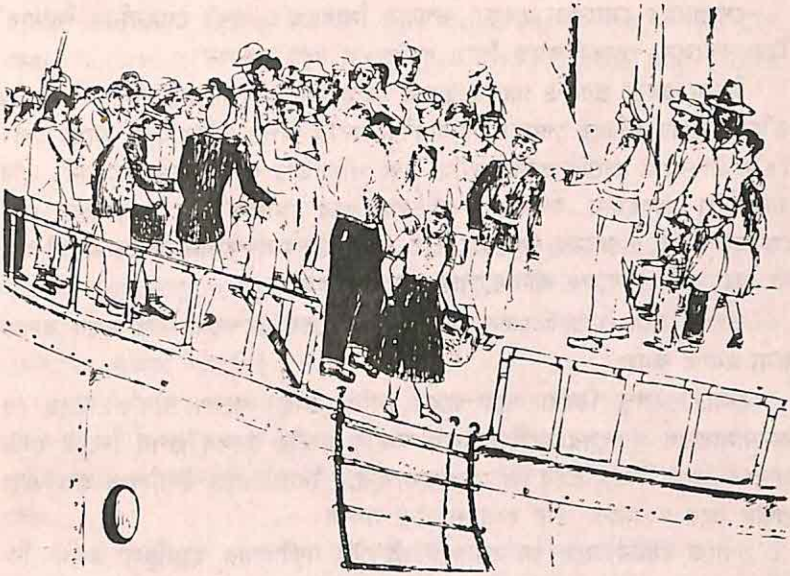
অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম তটভূমি থেকে ছয় মাইল দূরে হঠাৎ জাহাজখানি একটি ডুবো পাহাড়ের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেল।

তৎক্ষণাৎ নাবিক-কর্মীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। সবাই সজাগ হয়ে উঠল। বাঁশির শব্দ শোনা যেতে লাগল। ফলে যে আরো শব্দ আসতে লাগল তা বিশৃঙ্খলা এবং সন্ত্রাসের কোলাহল নয়।

একটা হুকুম ধ্বনিত হল :

—"নৌকায় ওঠ!"

যাত্রীরা নিজের নিজের কটিবেষ্টনী পরল।



একজন অন্ধকে সেতুর ওপর দিয়ে নিয়ে চলেছে তার চাকরানী। সবাই তাকে পথ ছেড়ে দিল। অশক্ত লোকটি, সকলের ইচ্ছা তারই সর্বপ্রথম সাহায্য পাওয়া উচিত।

কয়েক মুহূর্ত পরে জাহাজ খালি হয়ে গেল এবং অবিলম্বে ডুবে গেল।

একখানি নৌকাতে একটি মহিলা গান আরম্ভ করলেন। মাঝে মাঝে ঢেউয়ের শব্দ এসে তাঁর কণ্ঠস্বর ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তা সত্ত্বেও দাঁড়বাহীরা গানের অন্তরাটি শুনতে পাচ্ছিল আর পাচ্ছিল তাদের বাহুতে বল :

"তীরের পানে চল নাবিক
তীরের পানে চল।"

জাহাজডুবির যাত্রীরা শেষে কূলে পেঁছিল, সাহসী জেলেরা এসে তাদের তুলে নিল।

একজন যাত্রীও নিখোঁজ হয়নি। এমনিভাবে চারশ' পঞ্চাশ জন লোক তাদের স্থিরচিত্ততার জন্য আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল।

*
* *

এই শান্ত সাহসের কথা আমি আরো বলছি যা বিনা হট্টগোলে, ঢাকের বাদ্যি না বাজিয়েই অনেক মহৎ এবং উপকারী কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

ভারতবর্ষের কোনো এক গ্রামে পাঁচশ' ঘর লোকের বাস। তার পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে গভীর এক নদী।

সে-গ্রামের লোকেরা তখনো ভগবান সিদ্ধার্থের বাণী শোনেনি। সিদ্ধার্থ ঠিক করলেন, তাদের কাছে গিয়ে ধর্মপথের কথা বলবেন।

তিনি একটা প্রকাণ্ড গাছের তলায় গিয়ে বসলেন। গাছের ডালপালা নদীর তীরের ওপর ছড়িয়ে গেছে। গ্রামবাসীরা নদীর অপর তীরে এসে জড়ো হল। তিনি উচ্চকণ্ঠে তাদের কাছে প্রীতি এবং পবিত্রতার বাণী প্রচার করলেন। তাঁর কথাগুলি প্রবহমান জলধারা অতিক্রম করে আশ্চর্যভাবে পরপারে এসে পৌঁছল। তবুও গ্রামের লোকেরা তাঁর কথায় বিশ্বাস-স্থাপন করতে রাজী হল না, বরং তাঁর বিরুদ্ধে কানাঘুষোই করতে লাগল।

তাদের মধ্যে মাত্র একজন আরো জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে যাবার জন্য মনস্থ করল।

কোনো সেতু কিংবা পারাপারের নৌকা নেই। গল্পে বর্ণিত আছে যে অনন্যসাধারণ সাহসের বলে লোকটি নদীর গভীর জলের ওপর দিয়েই হাঁটা আরম্ভ করে দিল। এইরূপে সে শিক্ষাগুরুর নিকট এসে উপস্থিত হল এবং প্রণাম করে মহানন্দে তাঁর কথা শুনতে লাগল।

লোকে যেমন বলে যে লোকটি হেঁটেই নদী পার হয়েছিল একথা কি সত্যি? আমরা বলতে পারিনে। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, যে-পথ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় সেই পথ অনুসরণ করে লোকটি সাহসের পরিচয় দিয়েছে। আর গ্রামের লোকেরা তার দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হয়ে শেষে বুদ্ধের উপদেশাবলী শুনতে লাগল। তাদের মনের দরজা মহত্তর চিন্তারাজির কাছে খুলে গেল।

*

* *

এক রকমের সাহস আছে যার বলে নদী পার হওয়া যায়। আর এক রকমের সাহস আছে যা দিয়ে সৎ পথে উঠে দাঁড়ান যায়। কিন্তু সত্যের পথে প্রবেশ করার চেয়ে তাতে একনিষ্ঠ হয়ে লেগে থাকার জন্য আরও বেশি সাহসের দরকার।

মুরগী আর মুরগীছানার গল্প শোন :

ভগবান সিদ্ধার্থ তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছিলেন যথাসাধ্য চেষ্টা করতে এবং এই বিশ্বাস রাখতে যে যথাসাধ্যের ফল ফলবেই।

—"ঠিক যেমন" তিনি তাদের বললেন, "মুরগী ডিম পেড়ে তাতে তা দেয়, এ-রকম দুশ্চিন্তা তার মনেই আসে না : 'আমার বাচ্চা ছানারা কি ঠোঁট দিয়ে তাদের খোলস ভাঙতে পারবে, আলোর মুখ দেখতে পাবে?' তোমরাও তাই একটুও ভয় ক'রো না : যদি ধর্মের পথে লেগে থাক, তোমরাও আলোর মধ্যে পৌঁছাবে গিয়ে।"

এই হল যথার্থ সাহস, পথ ধরে চলে যাওয়া, ঝড় অন্ধকার কষ্টের মুখে দাঁড়ান, অধ্যবসায়ী হয়ে সর্বদা সর্বাবস্থায় কেবলই এগিয়ে চলা আলোর দিকে।

*

*   *

প্রাচীনকালে ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীর রাজা ছিলেন সেই সময় বিদেশী এক শত্রুরাজা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে একটি হাতিকে শিক্ষিত করে নিলেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হল। সুসজ্জিত হাতিটি তার প্রভু রাজাকে বয়ে নিয়ে এল বারাণসীর প্রাকার পর্যন্ত।

প্রাকারের ওপর থেকে অবরুদ্ধ নাগরিকরা ফুটন্ত উত্তপ্ত পদার্থ ফেলতে লাগল। প্রথমটা হাতি এই ভীষণ বর্ষণের মুখে পেছিয়ে এল।

তারপর যে-লোকটি তাকে শিক্ষিত করেছিল সে ছুটে তার কাছে গিয়ে বলল :

—"হাতি, তুমি না একজন বীর! বীরের মত কাজ কর, ভূমিসাৎ করে দাও এই ফটক।"

বিশালকায় জন্তুটি এই কথায় উৎসাহ পেয়ে ফটকের ওপর গিয়ে জোরে আঘাত করল, তাকে ভেদ করে বেরিয়ে এল তার রাজাকে জয়যুক্ত করে।

এমনি করে সাহস বাধা-বিপত্তি দূর করে, খুলে দেয় জয়ের দুয়ার।

*

*   *

লক্ষ্য ক'রো যে সকলেই, মানুষ তথা জন্তুজানোয়ার, একটা উৎসাহবাক্য দ্বারা সাহায্য পেতে পারে।

একটি সুন্দর মুসলমান গ্রন্থে তার এক দৃষ্টান্ত পাই মহামনা কবি সৈয়দের গল্পে।

তাঁর অসুখ করেছে জানতে পেরে বন্ধুরা একদিন খোঁজখবর নিতে এলেন। তাঁর পুত্র হাসিমুখে দ্বারদেশে তাঁদের অভ্যর্থনা করল, কারণ রোগীর অবস্থা ভাল।

রুগ্নব্যক্তির কক্ষে গিয়ে তাঁরা বসলেন এবং তখনো স্বভাবসুলভ সরস রসিকতা শুনে আশ্চর্য হলেন। পরে গরম একটু বেড়ে যেতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, অন্যরাও ঘুমিয়ে পড়ল।

সন্ধ্যেবেলা সবাই জেগে উঠলেন। আবু সৈয়দ অতিথিদের জন্য কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করলেন। তারপর ধূপ জ্বালিয়ে দিলেন চারিদিকে সুগন্ধ ছড়িয়ে দেবার জন্য।

আবু সৈয়দ একটু প্রার্থনা করলেন। অতঃপর উঠে তাঁর নিজের লেখা ছোট একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন :

"বিষাদের মধ্যে আশা হারিও না, কারণ এক আনন্দময়
মুহূর্ত এসে তোমার দুঃখ মুছে দিয়ে যাবে ;
অগ্নিময় ঝটিকা বয়ে যেতে পারে, আবার তা
বদলাতে পারে মলয় সমীরণে ;
গাঢ় মসীময় মেঘ জমে ওঠে, আবার প্লাবনের কোনো
চিহ্নপাত না করে মিলিয়ে যায় ;
ঘরে আগুন লাগতে পারে, আবার নিভে যেতে পারে
আসবাবপত্র স্পর্শও না করে ;
বেদনা দেখা দেয়, মুছেও যায় তেমনি ;
তাই ধৈর্য ধারণ ক'রো যখন বিপদ আসে,
কারণ অপরূপের জন্মদাতা হল আগামী কাল ;
ভগবানের শান্তি যদি পেয়ে থাক, তা হতে তুমি
আশা করতে পার বহুতর কল্যাণ।"

সবাই আশার বাণীতে ভরা এই সুন্দর কবিতাটি শুনে আনন্দ এবং সাহস লাভ করে যার যার বাড়ী ফিরে গেলেন। এইরূপে এক রুগ্ন বন্ধু তাঁর সুস্থ বন্ধুদের সাহায্য করেছিলেন।

তাঁর যাই হোক না কেন, যাঁর সাহস আছে তিনি অপরকেও সাহস দিতে পারেন, ঠিক যেমন একটা মোমবাতির আগুন আর একটাকে জ্বালাতে পারে।

বীর ছেলেমেয়েরা, তোমরা যারা এইটি পড়ছ, অপরকে সাহস দিতে শেখ, আর নিজেরাও হও সাহসী।

প্রফুল্লতা

তখন কোনো এক বর্ষাপ্রধান দেশের একটি মস্ত শহরে আমি। একদিন বিকেলে দেখতে পেলাম সাত-আটটা গাড়ি ভরতি হয়ে ছেলেমেয়েরা আসছে। সকালের দিকে গ্রামাঞ্চলে ঘাসের ওপর খেলা করতে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দুর্যোগের দরুন বাধ্য হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের আগে বৃষ্টির মধ্যেই তারা ফিরছে।

তা সত্ত্বেও তারা গান করছিল, উচ্চকণ্ঠে হাসছিল এবং পথিকদের দেখে রসিকতাপূর্ণ অভিবাদন জানাচ্ছিল।

এই বিষাদের সময়েও তারা প্রফুল্ল ছিল। দলের কেউ যদি কিছু বিষণ্ন হয়ে পড়ত তো অপর সকলের গান তাকে প্রফুল্ল করে তুলত। আর যে কর্মব্যস্ত পথচারীরা এই বালক-বালিকাদের হাসি শুনতে পেত তাদের কাছে মনে হত আকাশের অন্ধকার বুঝি এক মুহূর্তের জন্য হাল্‌কা হয়ে গেল!

*

* *

আমীর খোরাসানের যুবরাজ। প্রাচুর্যের মধ্যে দিয়ে যায় তাঁর জীবন। যুদ্ধে গেলে তিনশ' উট রন্ধনগৃহের আবশ্যকীয় বস্তু—হাঁড়ি, ডেকচি, কড়া, থালা ইত্যাদি—বহন করে।

একদিন খলিফা ইসমাইলের হাতে তিনি বন্দী হলেন। কিন্তু দুরদৃষ্টে পড়লেও মানুষ ক্ষুধার হাত থেকে রেহাই পায় না,—তাই আমীর তাঁর প্রধান পাচককে কাছে দেখতে পেয়ে সেই ভাল মানুষটিকে তাঁর জন্য কিছু খাবার তৈরী করতে বললেন।

পাচকের কাছে শুধু এক টুকরো মাংস ছিল। একটা পাত্রে সেটি আগুনের উপর সে চাড়িয়ে দিল। তারপর পদটি আরও একটু সুস্বাদু করবার উদ্দেশ্যে কিছু সবজি সংগ্রহ করতে বেরিয়ে গেল।

কাছাকাছি সেইখান দিয়ে একটা কুকুর যাচ্ছিল। মাংসের গন্ধ পেয়ে সে গিয়ে হাঁড়ির মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে দিল। তারপর আগুনের উত্তাপ লাগতেই তাড়াতাড়ি সরে গেল, কিন্তু এমন দুর্ভোগ যে তাতে হাঁড়িটা টুপির মত হয়ে তার মাথায় আটকে গেল। মাথা থেকে ওটা খুলতে না পেরে আচমকা ভয়ে অমনিভাবেই সে ছুটে পালাল।

আমীর দেখে হো হো করে হেসে উঠলেন।

—"যখন আপনার দুঃখ করারই ষোল আনা সব কারণ রয়েছে তখন আপনি হাসছেন যে?" যে কর্মচারীটি তাঁকে পাহারা দিচ্ছিল সে বলল।

তাঁবু থেকে কুকুরটি লাফিয়ে পালাচ্ছে দেখিয়ে আমীর তাকে বললেন,



"আমি এই ভেবে হাসছি যে আজই ভোরে তিনশ' উট আমার হেঁসেলটি বয়ে আনতে পারছিল না আর এখন একটা কুকুরেই তা অক্লেশে নিয়ে যেতে পারল!"

সর্বদা হাসিখুশি থাকতেই আমীর ভালবাসতেন। অপরকেও হাসিখুশি রাখতে তাঁর বেগ পেতে হত না। তা হলেও তাঁর এই সদানন্দ ভাবের যথাযথ মর্যাদা আমাদের দেওয়া উচিত। তিনি যদি ওই রকম ভীষণ বিপদের মধ্যেও হাসিঠাট্টা করে থাকতে পারেন, আমরা কি তার চেয়ে কম দুঃখকষ্টের মধ্যে হাসতে পারব না?

*

* *

পারস্যদেশে একটি স্ত্রীলোক মধু বিক্রি করত। তার ভারি সুন্দর ভদ্র ব্যবহার ছিল। তার দোকানের চারদিকে ক্রেতারা গিজ্‌গিজ্‌ করত। যে-কবি আমাদের এই গল্প বলেছেন তিনি বলছেন যে স্ত্রীলোকটি যদি বিষও বিক্রি করত তো লোকে তাই কিনতেই আসত।

স্ত্রীলোকটি তার মিষ্টি পণ্য থেকে এত লাভ করছে দেখে এক রুক্ষ-মেজাজী লোক ঠিক করল সে-ও ওই ব্যবসা করবে।

তার দোকান বসল। কিন্তু মধুর পাত্রগুলোর পেছনে লোকটির মুখ ছিল তেতো. যেসব ক্রেতারা কাছে আসত তাদের সংগে চড়া মেজাজে কথাবার্তা বলত। লোকেরা সবাই তার জিনিস তারই থাক বলে চলে যেত। "একটা মাছি পর্যন্ত তার মধুর উপর বসল না," কবি বলেছেন। সন্ধ্যে হয়ে গেল। তখনও তার কিছু বিক্রি নেই। একটি রমণী তাই দেখে তার স্বামীকে বলল. "লোকটার তেতো মুখ মধু পর্যন্ত তেতো করে ফেলেছে।"

মধুওয়ালী শুধু খদ্দের টানার জন্যেই কি হাসছিল। ধরে নেওয়া যাক বরং সেটা তার সুস্বভাবেরই পরিচয়। এই পৃথিবীতে আমরা কেবল বিকিকিনি

করতে আসিনি। এখানে আমাদের পরস্পর পরস্পরের বন্ধু হতে হবে। মধুর প্রকৃতির মেয়েটির ক্রেতারা মনে করত তার মধ্যে কি একটা জিনিস অধিকন্তু আছে : সে ছিল বিশ্বের আনন্দময় অধিবাসী।

*

* *

পরবর্তী যে ঘটনা আমি তোমাদের বলছি তাতে দেখতে পাবে প্রফুল্ল মন কেমন উচ্ছল ঝরনার মত উৎসারিত হয়। যাঁর কথা বলব তিনি লাভ বা খদ্দের পাবার বাসনা নিয়ে কোন কাজ করেননি। তিনি সুবিখ্যাত শ্রীরামচন্দ্র।

রাম দশ মাথা ও কুড়ি হাতবিশিষ্ট রাবণকে বধ করলেন। গল্পের আরম্ভটা আমি পূর্বেই বলেছি। যুদ্ধের মত যুদ্ধ হয়েছিল সেটা। রামের পক্ষ হয়ে লক্ষ লক্ষ বানর এবং ভালুক প্রাণ দিল। আর তাদের শত্রু রাক্ষসদের মৃতদেহ একটার পর একটা স্তূপাকার হয়ে উঠল। তাদের রাজার মৃতদেহ মাটির ওপর পড়ে। কিন্তু তাকে ঘায়েল করতে কি কষ্টই না লেগেছে! আঘাতের পর আঘাতে রাম তার দশটা মাথা এবং কুড়িটা হাত কেটে ফেললেন, কিন্তু সেই মুহূর্তেই আবার সেগুলো একে একে গজিয়ে উঠতে লাগল। তাদের সংখ্যা এত যে বোধ হতে লাগল যেন আকাশ থেকে হাত আর মাথার বৃষ্টি হচ্ছে।

দারুণ যুদ্ধ শেষ হলে যত বানর এবং ভালুক মরেছিল সবাই প্রাণ ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়াল যেন এক বিশাল সেনাবাহিনী আদেশের অপেক্ষা করছে।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র জয়লাভ করেও ছিলেন সরল শান্তস্বভাব। সহৃদয় দৃষ্টি দিয়ে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

অতঃপর রাবণের সিংহাসনে বিভীষণ অভিষিক্ত হলেন। যে সব যোদ্ধারা এরূপ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে তাদের জন্য তিনি গাড়ি বোঝাই মণিমাণিক্য এবং জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদ আনালেন।

রাম বললেন, "বন্ধু বিভীষণ, শোন, তুমি আকাশে উঠে সৈন্যদের মধ্যে উপহার সব ফেলে দাও।"

বিভীষণ তাই করলেন। রথ শূন্যে ঊর্ধ্বে উঠল, সেখান থেকে উজ্জ্বল সাজপোশাক এবং নানা সুন্দর রঙের পরিচ্ছদ তিনি নীচে ফেলে দিলেন।

আকাশ থেকে বর্ষিত ধনরত্ন আত্মসাৎ করার জন্য বানর এবং ভালুকেরা ছুটোছুটি করতে লাগল, একটা আর-একটার ওপর গড়াগড়ি খেয়ে চলল। একটা আনন্দের ঠেলাঠেলি পড়ে গেল।

রাম প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন, সীতাদেবী ও ভ্রাতা লক্ষ্মণও হাসতে লাগলেন।

সাহসী যারা তারা এমনি ভাবেই হাসতে জানে। খাঁটি এবং অকপট হৃষ্টতার চেয়ে সাহসপ্রদ বস্তু আর কিছুই নেই। ফলত বিপদের সময়ে সদয় হৃদয় থেকে উৎসারিত প্রফুল্লতা এক প্রকার সাহসই।

অবশ্য সব সময়ে হাসতেই যে হবে তা নয়; কিন্তু উৎসাহ, প্রসন্নতা, প্রফুল্লতা, এরা কখনো একেবারে অতিরিক্ত বস্তু নয়। আর এরা কি না করতে পারে! এদের দিয়ে মা তাঁর সন্তানদের জন্য গৃহখানি আনন্দময় করে তোলেন, শুশ্রূষাকারিণী রোগীকে দ্রুত নিরাময় করে তোলে, প্রভু তার ভৃত্যের কাজ সহজ করে দেয়, কর্মী তার সহকর্মীদের মধ্যে উৎসাহ বর্ধিত করে, যাত্রী কঠিন পথে সহযাত্রীদের সাহায্য করে, দেশের লোক দেশবাসীর অন্তরে আশা জাগিয়ে রাখে।

আর তোমরা, সুখী ছেলেমেয়েরা, হৃষ্টচিত্ত দিয়ে তোমরা কি না করতে পার?

আত্মনির্ভরতা

প্রাচীন আরবদের মধ্যে উদার দাতা বলে হাতিম তাই অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

—"তোমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ লোক তুমি কখনো দেখেছ?" একদিন এক বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করল।

—"দেখেছি", উত্তর দিলেন হাতিম তাই।

—"কে সে?"

—"একদিন একটা ভোজ-উৎসবে যারা চায় তারাই যোগ দিতে পারে এজন্য চল্লিশটি উট বলি দেবার ব্যবস্থা করলাম। তারপর কয়েকজন দলপতির সঙ্গে নিমন্ত্রণ করতে বের হলাম। পথে এক কাঠুরের সঙ্গে দেখা, সে এক আঁটি কাঁটাগাছ সবে কেটে বাঁধছিল। এই তার জীবিকা। তাকে গরিব দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম হাতিম তাই যে অঢেল ভোজ দিচ্ছে সেখানে সে যায় না কেন।



সে আমায় বলল, "নিজের অন্নের সংস্থান যে নিজে করে তার পক্ষে হাতিম তাইয়ের দয়ার প্রয়োজন হয় না।"

এই কাঠুরেকে হাতিম তাই কেন তাঁর চেয়েও শ্রেষ্ঠ বললেন?

কারণ যে দাতব্য করার অর্থ নিজে কোনো রকম কাজ না করা, কোনো রকম আত্মত্যাগ না করা, পরন্তু অপরকে আত্মনির্ভরশীল না হতে উৎসাহ দেওয়া, তার চেয়ে বেশি শোভন তিনি মনে করতেন নিজে পরিশ্রম করে নিজের জীবন ধারণ করা।

নিশ্চয়, এটা খুব স্বাভাবিক যে বন্ধু বন্ধুকে দান করবে উপহার; দৃঢ় বাহু যার সে দরিদ্রের দুঃখীর সাহায্যে এগিয়ে আসবে, এও ভাল; কিন্তু সুস্থ সবল যে সে নিজের হাতেই নিজে কাজ করবে, ভিক্ষার জন্য পরের কাছে হাত বাড়াবে না। তবে এ অধিকার তাঁদের দেওয়া যেতে পারে যাঁরা সর্বতোভাবে ধ্যানধারণার জীবনে, জ্ঞানের সন্ধানে নিরত।

*

*   *

মহৎ ছিল কাঠুরের স্বভাব। তবে তার চেয়েও পারস্যের রাজপুত্রের স্বভাব আরো ছিল মহৎ। সে-গল্প বলি তবে।

পুরাকালের রাজপুত্র। নাম তাঁর গুস্তাস্প্।

পিতার কাছ থেকে তিনি ভাবী রাজা হিসাবে যথেষ্ট মর্যাদা পেতেন না এই ক্ষোভে একদিন রাজ্য ছেড়ে পশ্চিম দিক ধরে হাঁটতে শুরু করে দিলেন। একাকী ক্ষুধার্ত, তখন বুঝতে পারলেন কাজ না করলে আর প্রাণ বাঁচান যাবে না। তাই সটান সেই রাজ্যের রাজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে বললেন :

—"আমি একজন যোগ্য নকলনবিস আপনার অধীনে এরকম কাজে নিযুক্ত হলে অনুগৃহীত হব।"

তাঁকে কয়েক দিন অপেক্ষা করতে বলা হল, কারণ তখন তখনই কোনো নকলনবিস দরকার ছিল না। প্রচণ্ড খিদের তাড়নায় তাঁর আর অপেক্ষা করার উপায় ছিল না। চলতে চলতে উট-চালকদের কাছে গিয়ে তিনি কাজ চাইলেন। এদেরও কোনো নূতন সঙ্গীর প্রয়োজন ছিল না। তথাপি বিপন্ন অবস্থা দেখে তারা তাঁকে খেতে দিল।

একটু কিছু দূরে গিয়ে গুস্তাস্প্ এক কামারের দরজায় উপস্থিত হলেন, এবং তার কাছে কাজ প্রার্থনা করলেন।

—"ধর তো" কর্মকারটি তাঁকে বলল, "এই লোহা পেটানোর কাজে আমায় সাহায্য কর।" বলে গুস্তাস্পের হাতে একটা হাতুড়ি গুঁজে দিল।

রাজপুত্রের শরীরে বেশ শক্তি ছিল। ভারি হাতুড়ি তুলে প্রথম আঘাতেই

নেয়াইটি তিনি ভেঙে ফেললেন। রেগে গিয়ে কর্মকার তখনি তাঁকে তাড়িয়ে দিল।

গভীর দুঃখে গুস্তাস্প্ আবার চলতে থাকেন।

যেদিকেই তিনি তাকান কোথাও তাঁর যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ নেই।

অবশেষে এক কৃষকের সঙ্গে তাঁর দেখা হল—সে গমের খেতে কাজ করছিল। গুস্তাস্পের অবস্থা দেখে তার দয়া হল এবং আশ্রয় ও আহার্য দিল।

একদিন সংবাদ শোনা গেল যে রুম-রাজার কন্যা বিবাহযোগ্যা, তাই যেখানে যত যুবক রাজকুমার আছে সবাইকে রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণে ডাকা হয়েছে। গুস্তাস্প্ ঠিক করলেন তিনিও যাবেন। গিয়ে সকলের সঙ্গে এক টেবিলে তিনি বসলেন। রাজকুমারী কিতাবান তাঁকে দেখতে পেলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভালবেসে ফেললেন এবং তাঁর অনুরাগের নিদর্শনস্বরূপ একটা গোলাপের তোড়া দিলেন।

গুস্তাস্প্ গরীব বলে রাজা তাঁর উপর ভীষণ বিরূপ হলেন বটে, তবে মেয়েকে সে-বিয়েতে বাধা দিতে সাহস করলেন না। কিন্তু বিয়ে হবার পরেই তিনি প্রাসাদ থেকে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। তখন তাঁরা দুজনে বনে গিয়ে বাস করার জন্য রওনা হলেন। সেখানে একটা নদীর কাছে তাঁরা তাঁদের ছোট্ট কুটির নির্মাণ করলেন।

গুস্তাস্প্ ছিলেন মস্ত শিকারী। রোজ নৌকা করে নদীর ওপারে যেতেন, হয়তো একটা হরিণ কিংবা বুনো গর্দভ ধরতেন, শিকারের অর্ধেক অংশ মাঝিকে দিয়ে বাকিটা এনে স্ত্রীকে দিতেন।

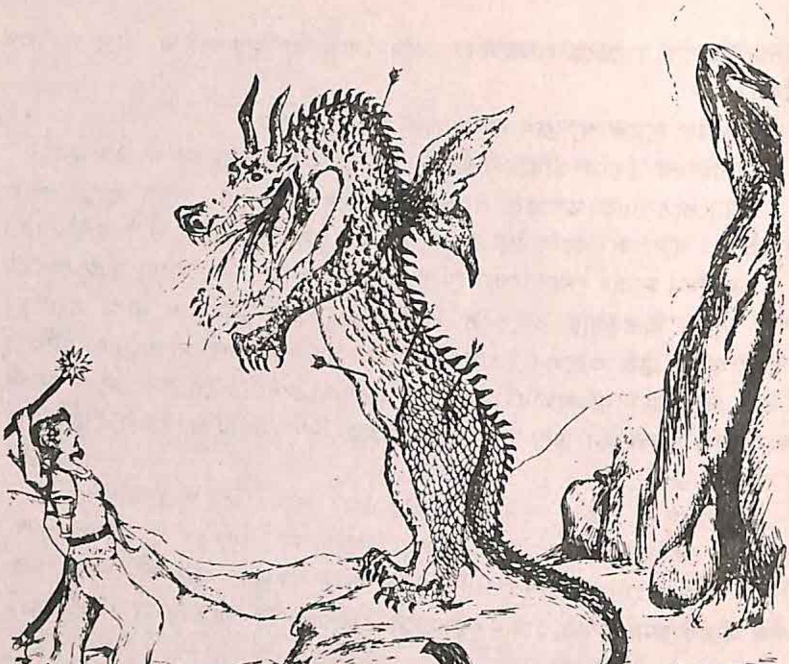
একদিন মাঝিটি মাব্রাঁ বলে তার দর্শনপ্রার্থী একটি যুবককে সঙ্গে নিয়ে এল।

—"মহাশয়", মাব্রাঁ বলল, "আপনার স্ত্রীর ভগ্নী রাজার দ্বিতীয় কন্যার আমি পাণিপ্রার্থী। শর্ত হল—একটা নেকড়ে রাজার খেতখামার ছারখার করছে, তাকে মেরে ফেলতে হবে। এখন কি উপায়ে তা সম্ভব জানিনে।"

—"আপনার কাজটি আমিই করে দেব," বললেন শিকারী গুস্তাস্প্। মরুভূমির মধ্যে চলে গেলেন তিনি। সেই ভয়ংকর জন্তুটিকে আবিষ্কার করে তাকে মারলেন দুটি তীর ছুঁড়ে। তারপর ভোজালি দিয়ে তার মাথাটা কেটে ফেললেন।

রাজা মৃত জানোয়ারটি দেখলেন এবং মহা খুশি হয়ে মাব্রাঁর হস্তে তাঁর দ্বিতীয় কন্যা অর্পণ করলেন।

কিছুদিন পরে মাঝিটি আহ্রাঁ নামে আবার একজন তরুণকে নিয়ে এল। এর ইচ্ছে রাজার তৃতীয় কন্যাকে বিয়ে করে, কিন্তু তার আগে তাকে একটা ড্রাগনকে বধ করতে হবে। গুস্তাস্প্ আশ্বাস দিলেন এ কাজটি তিনি করে দেবেন।



কতকগুলি ছুরি একসঙ্গে গোলাকারে বেঁধে তিনি বেরুলেন শিকার আবিষ্কারে। ড্রাগনটাকে তিনি দেখতে পেলেন, তার নিঃশ্বাসে আগুন বেরুচ্ছে। ভয়ঙ্কর জীবটার গায়ে অসংখ্য তীর নিক্ষেপ করলেন তিনি, তার থাবার হাত থেকে এ-পাশে ও-পাশে লাফিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে তারপর ছুরির বলটা একটা ভল্লের ডগায় বিঁধিয়ে ড্রাগনের গলার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। ড্রাগন চোয়াল বন্ধ করেই হল ভূতলশায়ী। রাজপুত্র তখন তরোয়াল দিয়ে তাকে শেষ করলেন।

আহ্‌রাঁ তৃতীয় রাজকন্যাকে বিয়ে করল।

তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে না যে এরূপ সাহসী রাজপুত্র পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়ে পরে পারস্যদেশের রাজা হয়েছিলেন। এই গুস্তাস্‌পের রাজত্বকালেই সন্ত নবী জেরদুস্ত বা জরথুস্ত্র পারস্যবাসীদের কাছে প্রচার করেছিলেন সেই ধর্ম যা শিক্ষা দেয় অরমুজ নামে আলো সূর্য অগ্নি নিষ্ঠা ও ন্যায়ের অধীশ্বর যে দেবতা তাঁর আরাধনা করতে।

*

*   *

তবে লক্ষ্য করে থাকবে তোমরা যে গুস্তাস্প্ চট করে এক মুহূর্তে তাঁর যোগ্য স্থান বা যোগ্য কাজ লাভ করেননি।

অনেক জিনিস নিয়ে তাঁকে বিফল চেষ্টা করতে হয়েছে। এমনকি গোড়ায় তাঁকে অনেকের কাছ থেকে বিরুদ্ধাচরণও পেতে হয়েছিল। উদাহরণ, বেচারা কর্মকারের কাছ থেকে যেমন।

শেষে কিন্তু তিনি পেলেন তাঁর যথার্থ পদমর্যাদা, আর পেলেন অন্যদের সাহায্য করতে, পরে আরো পেলেন তাদের সুশাসনের মধ্যে রাখতে। আর এই অপরকে সাহায্য করেছিলেন বলেই তিনি কাঠুরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যে কাঠুরের কথা এই মাত্র আমরা বলেছি। কারণ, যেমন গল্পে আছে, সে শুধু নিজের জন্য শ্রম করেই ছিল সন্তুষ্ট। গুস্তাস্প্ দাতা হাতিম তাইয়ের চেয়েও মহৎ ছিলেন, শুধু অতিরিক্ত যে ধনসম্পদ তাই বিলিয়ে দেওয়া নয়, পারস্যের রাজকুমার দান করেছিলেন তাঁর স্বহস্তের শক্তি এবং তা পরের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন ক'রে।

তার চেয়ে বেশি সম্মানের যোগ্য আর কেউ নয় যে আত্মনির্ভর হয়ে নিজের শক্তিতে শুধু নিজেরই সব অভাব মোচন করে না, অধিকন্তু আত্মীয়বন্ধুদেরও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান এবং শ্রীবৃদ্ধি করে। এস আমরা প্রত্যেকে আমাদের পিতাকে সম্মান করে চলি, তা তিনি স্থপতিই হোন অথবা কাঠুরেই হোন, লেখক হোন অথবা কুলি-মজুরই হোন, বণিক, কর্মকার অথবা আবিষ্কারক হোন, যিনি তাঁর শ্রমের দ্বারা, তা যে রকমেই হোক না কেন, নিজের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করেন এবং অপরেরও স্বাচ্ছন্দ্য বর্ধিত করেন।

এস আমরা সেই শ্রমিকের সম্মান করি যে যুগপৎ নিজের ও অন্যদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের নিয়ে সমবায় পদ্ধতিতে কারখানা গড়ে তোলে, কিংবা দোকান অথবা সঙ্ঘ সংগঠিত করে যাতে প্রত্যেকে তার ন্যায্য অধিকারের দাবি জানাতে পারে, একক দুর্বল আর্ত কণ্ঠের পরিবর্তে যাতে বহুর শক্তিমান কণ্ঠ ধ্বনিত হয়।

পেশা অনুসারে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকরা এইভাবে আত্মশক্তির ওপর নির্ভরশীল হতে এবং পরস্পরকে সাহায্য করতে শিক্ষা লাভ করবে।

ছাত্রছাত্রীগণ, তোমরাও শেখ তোমাদের বুদ্ধি সমৃদ্ধ করে তুলতে, তার জন্য শিক্ষক মহাশয় যে পাঠ দেবেন তার ওপর একাগ্র হয়ে মনোযোগ দেবে, যথাসাধ্য শক্তি নিয়োগ করবে জ্ঞানের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে; তেমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন মত তোমার সতীর্থ কেউ তোমার চেয়ে অপটু অকৌশলী থাকলে তাকেও সাহায্য করতে শেখ।

পরীদের গল্পে একটি মাত্র শব্দ-উচ্চারণে, একটি প্রদীপ ঘষা মাত্রই, একটি যাদুদণ্ডের সঞ্চালনেই দৈত্যদানারা এসে হাজির হয়, মানুষকে শূন্যে তুলে নিয়ে

যায়, চোখের পলকে রাজপ্রাসাদ তৈরী করে ফেলে, মাটি ফুঁড়ে বের করে নিয়ে আসে দলে দলে হাতি এবং অশ্বারোহী সৈন্য।

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এর চেয়েও বিস্ময়জনক ঘটনা ঘটায় : প্রচুর ফসলে ঢেকে ফেলে পৃথিবী, বন্য জন্তু পোষ মানায়, পাহাড় ভেদ করে, জাঙ্গাল এবং সেতু তৈরী করে, নগর নির্মাণ করে, জলের ওপর জাহাজ ভাসায়, আকাশপথে বিমান চালনা করে, সর্বোপরি সকলের জন্য অধিকতর মঙ্গল এবং নিরাপত্তা সৃষ্টি করে।

এই গুণের কল্যাণে মানুষ হয়ে ওঠে অধিকতর মহৎ, অধিকতর ন্যায়নিষ্ঠ, অধিকতর সদয়—আর এতেই হল যথার্থ উন্নতি।

ধৈর্য এবং অধ্যবসায়

পাঞ্জাবীদের মধ্যে একটা গান আছে :

সদা না বাগীন্ বুলবুল বোলে,
সদা না বাগ বাহারান্ ;
সদা না রাজ খুসী দে হোন্দে,
সদা না মজ্‌লিস ইয়ারান্ !

বাংলায় তার অর্থ :

বুলবুল বাগানে চিরকাল গান করে না,
বাগানের যে শোভা তাও চিরকাল থাকে না ;
রাজা যে চিরকাল মহানন্দে রাজত্ব করতে পারেন তা নয়,
প্রিয়জনেরাও চিরকাল একসঙ্গে থাকতে পায় না।

এই গানটির সারমর্ম হল যে চিরকাল আমরা সুখী থাকতে পারি না এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হল ধীর হতে শেখা। কারণ ধৈর্যশিক্ষার সুযোগ হয় না এমন দিন খুব কমই আছে।

ভীষণ ব্যস্ত কোন লোকের কাছে তোমার কিছু চাইবার আছে। তুমি তার বাড়ী গেলে। ইতিমধ্যে বহু লোক সেখানে জড়ো হয়েছে। ডাক পড়ার আগে পর্যন্ত তোমার অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। তুমি সেখানে স্থিরচিত্তে রইলে, হয়তো-বা কয়েক ঘণ্টা ধরেই তুমি ধীর হতে পেরেছ।

আর একবার যাঁর সঙ্গে তুমি দেখা করতে গেলে, দেখলে তিনি বাড়ীতে নেই। পরদিন আবার গেলে ফিরে। তখনো দেখলে দরজা বন্ধ। তৃতীয়বার গেলে। লোকটি অসুস্থ, তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না। কিছুদিন বাদে তুমি আবার গেলে এবং ধরো তখন নূতন একটা বাধা ঘটল যাতে তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হল না। কিন্তু তাতে তুমি নিরুৎসাহ না হয়ে লেগে থাকলে যে-পর্যন্ত না তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হয়। এই রকমের ধৈর্যকে বলে অধ্যবসায়।

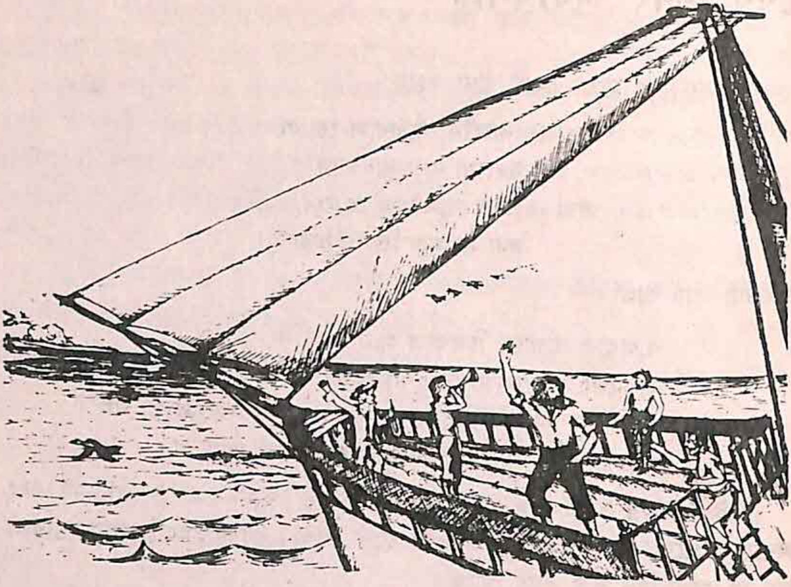
অধ্যবসায় হল সক্রিয় ধৈর্য, গতিশীল ধৈর্য।

*

* *

জেনোয়াবাসী প্রসিদ্ধ নাবিক কলম্বাস স্পেন থেকে পশ্চিমের অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার জন্য যাত্রা করলেন।

দিন যায়। সপ্তাহ যায়। সঙ্গীসাথীদের আপত্তি উঠতে থাকে কিন্তু তিনি সংকল্প হারান না যে একটা নূতন দেশে গিয়ে পৌঁছবেনই। বিলম্বে বিঘ্নে নিরুৎসাহ না হয়ে শেষ পর্যন্ত কলম্বাস আমেরিকার প্রথম দ্বীপগুলিতে গিয়ে পদার্পণ করলেন। এইরূপে তিনি একটা নূতন মহাদেশ আবিষ্কার করেছিলেন।



সঙ্গীদের কাছ থেকে তিনি কি চেয়েছিলেন?

চেয়েছিলেন তারা শুধু যেন ধৈর্য ধরে থাকে। কারণ তাদের কাজ ছিল কেবল তাঁর উপর নির্ভর করে থাকা এবং বিনা প্রতিবাদে তাঁর নির্দেশ মেনে চলা। লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য তাঁর নিজের কি প্রয়োজন ছিল? তাঁর প্রয়োজন ছিল সেই দৃঢ় শক্তি, সেই মনোবলের নিষ্ঠার—যাকে বলা হয় অধ্যবসায়।

*

*   *

প্রসিদ্ধ কুমোর বার্নার্ড পালিস্যি নানা উজ্জ্বল রঙে মিনে করা প্রাচীন কালের সুন্দর চিনেমাটি গড়ার লুপ্তরহস্য উদ্ধার করতে চেয়েছিল।

দিনের পর দিন বছরের পর বছর ধরে অক্লান্তভাবে সে তার গবেষণা চালাতে লাগল। বহুদিন যায়। তার এই এনামেল আবিষ্কারের চেষ্টায় কোন ফল হয় না। সে তার যথাসর্বস্ব এতে উৎসর্গ করল। দিবারাত্রি নিজের তৈরি উনুনের সামনে বসে পরীক্ষা করতে লাগল—চিনেমাটির জিনিস তৈরি করবার এবং পোড়ানর নূতন নূতন পদ্ধতি নিয়ে। এতে কেউ যে তাকে শুধু সাহায্যই করেনি বা উৎসাহ দেয়নি তা-ই নয়, তার বন্ধুরা এবং প্রতিবেশীরা বরং তাকে পাগল নাম দিয়েছে। তার স্ত্রী পর্যন্ত তার এই কাজের জন্য তাকে দোষারোপ করেছে।

অর্থাভাবে অনেকবার তাকে কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছে। আবার যখনই সুবিধা হয়েছে তখনই সে নবীন উৎসাহে লেগেছে। অবশেষে একদিন এমন হল যে উনুন জ্বালবার যথেষ্ট কাঠ নেই। তখন আশেপাশের লোকেদের চীৎকার এবং নিষেধ সত্ত্বেও সে তার নিজের সমস্ত আসবাবপত্র নিঃশেষে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করল। সে-সব পুড়ে গেলে উনুনের ঢাকনা খুলে সে দেখতে পেল উজ্জ্বল এনামেল ভরা সেখানে। এই আবিষ্কারের জন্য সে বিখ্যাত কিন্তু কত বছর এজন্য ব্যর্থ চেষ্টা করতে হয়েছে।

নিজের স্ত্রী এবং বন্ধুদের মধ্যে কিসের অভাব ছিল যাতে তারা তাকে বিব্রত না করে, তার কাজ দুরূহতর না করে, সাফল্যের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না? স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে তা ধৈর্য। আর কি জিনিস তার ছিল—মাত্র একটি জিনিস—যার কখনো অভাব হয়নি এবং যা তাকে সকল বিপদে বিদ্রূপের বিরুদ্ধে জয় এনে দিয়েছিল? তা হল, অধ্যবসায়—যে-শক্তি সকলের চেয়ে বলবান।

কারণ পৃথিবীতে এমন কোনো জিনিস নেই যা অধ্যবসায়কে বিফল করতে পারে। এমনকি বৃহত্তম বস্তু সব সর্বদাই ছোট ছোট অক্লান্ত প্রচেষ্টার সমবায়ে নিষ্পন্ন হয়।

একই স্থানে একটির পর একটি জলের ফোঁটা ক্রমাগত পড়ে শেষে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে প্রকাণ্ড একটা পাথর।

এক কণা বালি কিছু শক্তিশালী জিনিস নয়। কিন্তু তারা যখন একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চলে তখন সৃষ্টি করে বালির পাহাড়, রোধ করে সমুদ্রের গতি।

আর যখন ভূতত্ত্ব পড়বে তখন জানতে পাবে যে সমুদ্রের নীচে পাহাড় গড়ে ওঠে ক্রমান্বয়ে একের পর এক কীটাণু জমে, তাদেরই অনবচ্ছিন্ন প্রয়াসের ফলে জলধারার উপরে মাথা তুলে দেখা দেয় কি চমৎকার দ্বীপ আর দ্বীপপুঞ্জ।

একবার ভেবে দেখেছ কি তোমাদেরও পুনঃ পুনঃ প্রয়াস এরকমই কত বিরাট জিনিস সৃষ্টি করতে পারে?

*

* *

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শঙ্করাচার্যের নামে মালাবার দেশ গৌরবান্বিত। তিনি প্রায় ১২০০ বছর আগে জীবিত ছিলেন। ছেলেবেলাতেই তাঁর সঙ্কল্প ছিল যে সন্ন্যাসী হবেন।

তাঁর জননী পুত্রের এই মহৎ ইচ্ছায় প্রীত হলেও সে-ধরনের জীবন গ্রহণে সম্মতি দিলেন না।

একদিন মাতাপুত্রে মিলে স্নান করতে গিয়েছেন। শঙ্কর ডুব দিতেই টের পেলেন যে একটা কুমীর তার পা কামড়ে ধরেছে। অবিলম্বে মৃত্যু নিশ্চিত।

তথাপি এই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে নির্ভীক বালক তাঁর মহান আদর্শের কথা স্মরণ রেখে মাকে চীৎকার করে বলল : "আমার মৃত্যু অনিবার্য। কুমীরে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর এই পূর্বমুহূর্তটিতে অন্তত সন্ন্যাসী হয়ে যাবার অনুমতি দিন।"

—"তাই হোক বাছা," অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে অসহায় মাতা বললেন। শঙ্কর এত আনন্দিত হলেন এবং এমন জোর পেলেন যে পা ছাড়িয়ে নিতে সমর্থ হলেন এবং লাফিয়ে তীরে গিয়ে উঠলেন।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জ্ঞানও বেড়ে উঠতে লাগল। তিনি গুরু হলেন শেষে। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞানপ্রচারের মহৎ কর্ম থেকে তিনি বিরত হননি।

*

*   *

ভারতবর্ষকে যারা ভালবাসে তারা সকলেই মহাভারত নামক অনুপম কাব্যকে জানে।

এই গ্রন্থ বহু শতাব্দী আগে সংস্কৃতে লেখা হয়েছিল। সাম্প্রতিক কালের পূর্বে কোন য়ুরোপীয় ব্যক্তি এটি পড়তে পেত না—সংস্কৃত জানা না থাকলে। আর তখন সংস্কৃতের প্রচলন ছিল খুবই কম। য়ুরোপীয় কোন এক ভাষায় এর অনুবাদ দরকার হল।

বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় স্থির করলেন তিনি এই কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। দেশে কিশোরীমোহন গাঙ্গুলী বলে তাঁর এক শিক্ষিত বন্ধু ছিলেন। সংস্কৃত পুস্তকখানির—যার একশ' ভাগে পর পর প্রকাশ হয়—অনুবাদ করার যোগ্যতা তাঁর ছিল।

এই কাজ নিয়ে প্রতাপচন্দ্র রায় বারো বছর ধরে নিবিষ্ট ছিলেন। তিনি সমস্ত অর্থ এই পুস্তকের মুদ্রণে নিয়োগ করলেন। অবশেষে নিঃস্ব হয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন করতে লাগলেন এবং সহানুভূতিসম্পন্ন লোকেদের কাছে সাহায্য চাইতে লাগলেন। তিনি রাজপুত্র থেকে গরীব চাষা, পণ্ডিত থেকে মূর্খ, য়ুরোপ এবং আমেরিকাবাসী সকলের সাহায্য লাভ করেছিলেন।

এই রকম ভ্রমণকালে একবার তিনি মারাত্মক জ্বর নিয়ে আসেন। তাতে তাঁর মৃত্যু হয়। অসুখের মধ্যেও তাঁর সমস্ত চিন্তা ছিল কাজ সম্পূর্ণ করা যায় কি করে তা নিয়ে। এমনকি যখন শেষ মুহূর্তে কথা বলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তখন স্ত্রীকে বললেন :

—"বইটি শেষ করা অবশ্যকর্তব্য। যদি মুদ্রণের জন্য অর্থ প্রয়োজন হয় তবে আমার সৎকারে ব্যয় ক'রো না। মহাভারতের জন্য যথাসম্ভব সরল মিতব্যয়ী জীবন কাটিয়ো।"

ভারতবর্ষ এবং ভারতের মহাকাব্যের জন্য হৃদয়-ভরা অনুরাগ নিয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

তাঁর বিধবা স্ত্রী সুন্দরীবালা রায় এই মহান ইচ্ছা একনিষ্ঠ হয়ে প্রতিপালন করেছিলেন। এক বছর পরে অনুবাদক তাঁর কাজ সম্পন্ন করলেন। একাদশ খণ্ডে মহাভারত য়ুরোপের জনমণ্ডলীর কাছে প্রকাশ হল। সেই থেকে তারা এই অপূর্ব মহাকাব্যের অষ্টাদশ পর্ব পাঠ এবং তার রসগ্রহণ করতে সমর্থ হল। তা পড়ে য়ুরোপীয়গণ ভারতের এই সব গভীর চিন্তাশীল প্রাচীন কবি-কুলের বুদ্ধি ও জ্ঞানকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে।

প্রতাপচন্দ্র রায় এবং আরো অপরাপর বহু সুকর্মী লোকের মত যারা অধ্যবসায়ী হতে জানে তাদের চেষ্টার এমনই সুফল হয়।

তোমরা, সরলমতি বালকবালিকারা, তোমরা কি চাও না তোমাদের নাম সেই সব নরনারীর সঙ্গে যুক্ত হোক যাঁরা ভাল কাজে ক্লান্তি মানেন না, যাঁরা কর্তব্য শেষ না করে কখনো ছেড়ে দেন না?

এই বিরাট পৃথিবীতে করবার মত ভাল কাজের অভাব নেই। সে-সব কাজে হাত দেবার মত লোকেরও কিছু অভাব নেই। তবে প্রায়শঃই যার অভাব দেখা যায় তা হল অধ্যবসায়ের, একমাত্র যে-বস্তু তাদের নিয়ে যেতে পারে শেষে পূর্ণ সাফল্যে।

সরল জীবন

হজরত মহম্মদ আরববাসীদের ধর্মশিক্ষা দেওয়ার জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আরাম কিংবা অর্থের দিকে তাঁর দৃকপাত ছিল না।

একদা রাত্রিতে তিনি একটা শক্ত খাটিয়ার ওপর ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘুম থেকে উঠলে দেখা গেল তাঁর গায়ে খাটিয়ার দড়ির ও আঁশের দাগ বসে গিয়েছে।

এক বন্ধু বললেন :

—"হে আল্লার দূত! এই শয্যা আপনার পক্ষে অতিশয় কঠিন। আমায় একবার বললেই সানন্দে আমি আপনার জন্য একটি আরও নরম শয্যা তৈরি করে দিতাম—আপনার বিশ্রাম হত মধুরতর।"

হজরত বললেন :

—"নরম বিছানা আমার জন্য নয়। পৃথিবীতে আমি একটা কাজের ভার নিয়ে এসেছি। তবে আমার শরীর যখন চায় বিশ্রাম তখন তা আমি দিই তাকে। কিন্তু তা হল—অশ্বারোহী যেমন সূর্যের উত্তাপ থেকে বিশ্রামের জন্য তার ঘোড়াকে গাছের ছায়ার নীচে এক মুহূর্ত দাঁড় করিয়ে আবার একটু পরেই যাত্রা শুরু করে, তেমনি।"

পৃথিবীতে একটা কাজের ভার নিয়ে এসেছি, বলেছিলেন হজরত। সেই জন্যই তাঁর জীবন ছিল সরল জীবন। আদর্শের ওপর স্থির বিশ্বাস ছিল, তার জোরে তিনি আরববাসীদের সবাইকে ধর্মশিক্ষা দিতে মনস্থ করেছিলেন। বিলাসিতার জিনিসের জন্য তাঁর ব্যগ্রতা ছিল না : আরো উচ্চতর চিন্তার দিকে তাঁর অন্তর উন্মুখ হয়ে ছিল।

*

* *

পরের এই আরবদেশীয় গল্পে দেখা যাবে সুস্থ চিত্ত যার সে অন্য কিছুর চেয়ে সরল জীবনে বেশি তৃপ্তি লাভ করে।

কাল্‌ব্‌ জাতির মেয়ে মৈশূন। জীবনের প্রথম বছরগুলি সে কাটিয়েছে তাঁবুতে তাঁবুতে, মরুভূমির মধ্যে।

একদিন খলিফা মুয়াবিয়ার সঙ্গে তার বিয়ে হল। তাঁর অনেক ধনরত্ন, অনেক দাসদাসী—তবু তাঁর সঙ্গে থেকে মৈশূন সুখী হল না। চতুর্দিকের এই যে বিলাসিতা এর মধ্যে তার মন শান্তি পায় না। নিজেকে একলা পেলে প্রায়ই সে আরবীতে তার নিজের লেখা কয়েকটি লাইন গুন্‌ গুন্‌ করে গাইত :

"উটের বাদামী লোমের পোশাক রাণীর রাজভূষণের চেয়েও
আমার নয়নে সুন্দর।
রাজপ্রাসাদের বিপুল কক্ষসমূহের চেয়ে মরুভূমির তাঁবু আমার প্রিয়।

বিপুল সাজসজ্জায় পীড়িত অশ্বতরের চেয়ে আরবের প্রান্তরে
তাঁবুর চারিদিকে যে তরুণ অশ্বরা লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলে
তারা আমার কাছে বেশি ক্ষিপ্রগতি মনে হয়।
রাজপ্রাসাদের দ্বাররক্ষীরা যে করিদন্তের শৃঙ্গধ্বনি করে তার চেয়ে
শ্রুতিমধুর আমার মনে হয় অপরিচিতের আবির্ভাবে
সাবধানী কুকুরের ডাক।"

তার গান রাজা শুনতে পেলেন এবং তাকে রাজগৃহ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। কবি তখন তার নিজের দলে ফিরে গেল মহানন্দে, কারণ যে জমকালো প্রাসাদ তাকে কেবল দুঃখই দিত তা আর কখনো তাকে দেখতে হবে না।

*

* *

সকল দেশেই বহু লোক এখন উপলব্ধি করছেন যে-জীবন অতিব্যয়, বাহ্যঠাট এবং মিথ্যাগর্বের মধ্যে বয়ে চলে, তার চেয়ে সহজ সরল জীবন বেশি কাম্য।

দামী জিনিসপত্র কেনবার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অনেক লোক আজ ভাবতে আরম্ভ করেছেন যে তাঁদের অর্থ দিয়ে আরো ভালো কাজ করা যেতে পারে। দামী আহার্যের বদলে তাঁরা পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করছেন, গৃহসজ্জায় ব্যবহার করছেন সহজ সুদৃঢ় সুরুচিকর আসবাব—জটিল জাঁকজমকপূর্ণ অনাবশ্যক-তার ভিড় কতগুলো নয়, সে-সব শুধু দোকানে যেন দর্শকদের নয়ন-রঞ্জনের জন্য সাজিয়ে রাখা।

সর্বকালে পৃথিবীকে এগিয়ে দিয়ে চলেছেন যে-সব শ্রেষ্ঠ ও কর্মিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁরা শান্ত মিতাচারীর জীবন যাপন করতে জানেন: তাতে শরীরের স্বাস্থ্য বজায় থাকে, মানুষ সমর্থ হয়ে ওঠে সর্বজনের হিত সাধনে অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে। এমন মানুষের আদর্শ লজ্জা দেবে তাদের যারা নিজেদের চতুর্দিকে অনাবশ্যক ধনরত্ন স্তূপীকৃত করে, আর শেষে নিজেরাই তাদের রাশিকৃত পোশাক-আসবাবের, তাদের নিজেদের দাসেরও দাস হয়ে ওঠে।

গর্ত না করে মাটির ঢিবি করা যায় না: প্রায়শঃই কয়েকজনের প্রাচুর্য অপর বহুজনের দারিদ্র্য ঘোষণা করে। এই পৃথিবীতে করণীয় অনেক সুন্দর, মহৎ এবং কল্যাণকর কাজ রয়েছে, রয়েছে এই জন্য যে যাদেরই একটু বুদ্ধি আছে তারা যেন তাদের সময়, অর্থ এবং চিন্তা অন্য বাজে কাজে অপব্যয় না করে।

*

* *

সেন্ট ফ্রান্সিস সন্মার্গের বাণী এনেছিলেন। অর্থলাভের উদ্দেশ্যে তিনি জ্ঞান বিতরণ করেননি। তাঁর জীবন ছিল সরল, তাঁর পরম আনন্দ ছিল নিজের

দৃষ্টান্ত এবং উপদেশ দিয়ে লোকদের উন্নতিসাধনে। অপরে যা দান করতো তাতেই আহার সমাধা করে তিনি সন্তুষ্ট হতেন।

একদিন এক শহরের প্রান্ত দিয়ে তিনি চলেছেন। সঙ্গে সহযাত্রী সতীর্থ মাতেও-ও রয়েছে। মাতেও একটা পথ ধরে চললেন, ফ্রান্সিস নিলেন অন্য আর একটা। মাতেও দীর্ঘ সুপুরুষ। নিজে তিনি তার বিপরীত—খর্বকায়, দেখতে সাধারণ লোকের মতই। সকলে প্রথমজনকে দান করল প্রচুর; ফ্রান্সিস পেলেন অতি সামান্য কিছুই।

শহরের ফটকের বাইরে তাঁদের দেখা হল; দুজনে একটা প্রকাণ্ড পাথরের সামনে বসলেন। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি স্বচ্ছ ঝরনা। তাঁদের সঞ্চয় তাঁরা একত্র করলেন।



—"ভাই মাতেও," হাসিমুখে বললেন সেন্ট ফ্রান্সিস, "এত বড় মহোৎসবের যোগ্য আমরা নই।"

—"তা ঠিক, কিন্তু এই কয়েকটা রুটির টুকরো দিয়ে আমরা কোথায় পাচ্ছি মহোৎসব? আমাদের না আছে ছুরি কাঁটা, না একটা চাদর, না তোয়ালে, না কোন দাসদাসী," বললে মাতেও।

—"এই-ই কি উৎসবের ভোজ নয়" সাধুটি বললেন, "যখন খিদের সময় পেয়েছ পরিচ্ছন্ন টেবিলের ওপর ভাল রুটি, তৃষ্ণার সময় পরিষ্কার ঝরনার শীতল জল?"

এর অর্থ এমন বলা নয় যে, গরীব লোকেরা চিরদিন সামান্য ভিক্ষার ওপর তাদের ভাগ্যকে ছেড়ে দিয়ে জীবন কাটাবে। আসলে এখানে দেখান হয়েছে মহৎ জীবন সকল অবস্থায় দেয় যে গভীর তৃপ্তি এবং মহাপুরুষরা অন্তরে বহন করেন যে প্রফুল্লতা তা কতই-না পূর্ণ করে দিতে পারে বহু স্থূল-জিনিসের ও বাহ্যসম্পদের অভাব।

*

* *

একটা জিনিস স্থিরনিশ্চিত—সরল জীবন যাপন করে কেউ কখনো ক্ষতি-গ্রস্ত হয়নি; কিন্তু বিলাসিতা আর অত্যধিক প্রাচুর্যের সম্বন্ধে তা বলা চলে না। প্রায়শঃই অদরকারী জিনিসগুলি মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ আকবরের রাজত্বকালে আগ্রাতে বানারসি দাস বলে একজন জৈন সাধু বাস করতেন। সম্রাট তাকে রাজপ্রাসাদে ডাকিয়ে এনে বললেন:

—"আপনার ইচ্ছামত যা খুশি আমার নিকট প্রার্থনা করুন: আপনার সাধুর জীবন—আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করা হবে।"

—"পরব্রহ্ম আমাকে দরকারের চাইতেও বেশি দিয়েছেন," সাধু উত্তর দিলেন।

—"তবু আপনি প্রার্থনা করুন," আকবর পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

—"সম্রাট, তাহলে আমার প্রার্থনা—আমাকে কখনো আর এই প্রাসাদে ডাকবেন না, কারণ আমি চাই আমার সময় ভগবৎ-কর্মে নিয়োজিত করতে।"

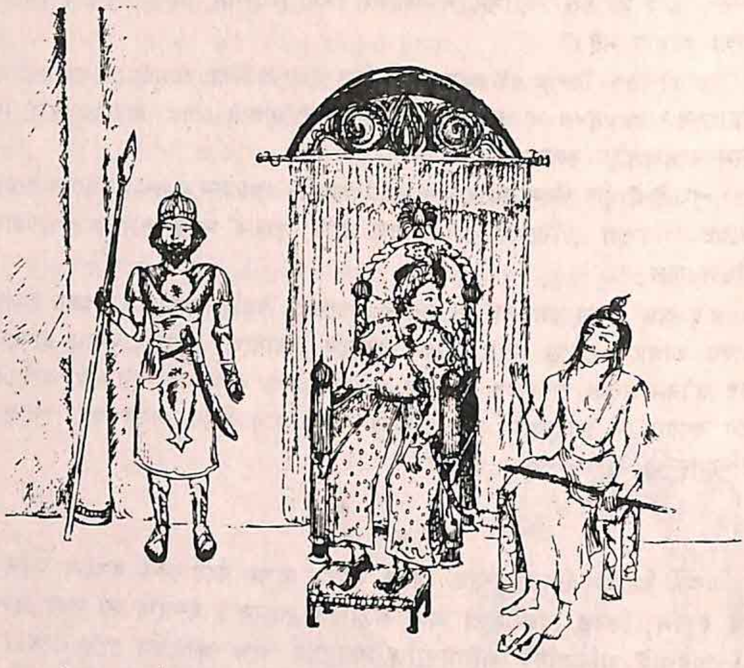
—"আচ্ছা তাই হবে," আকবর বললেন। "এখন আমার পালা, এবার আমি আপনার কাছে একটি প্রার্থনা জানাব।"

—"বলুন সম্রাট।"

—"আমায় কয়েকটি সদুপদেশ দিন যা স্মরণ এবং অনুসরণ করে চলতে পারি।"

বানারসি দাস এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন:

—"দেখবেন আপনার আহার্য যেন হয় স্বাস্থ্যকর এবং পরিষ্কার, আর বিশেষ করে রাতে লক্ষ্য রাখবেন মাংস এবং পানীয়ের ওপর।"



—"আপনার উপদেশ আমি ভুলব না," সম্রাট তাঁকে বললেন। উপদেশগুলি যথার্থই ছিল সারগর্ভ। যেহেতু স্বাস্থ্যকর খাদ্য এবং পানীয় শরীরকে সুস্থ রাখে, তাকে শুদ্ধ চিন্তা ও শুদ্ধ জীবনের উপযুক্ত মন্দিরে পরিণত করে।

যেদিন সাধুটির সঙ্গে সম্রাটের দেখা হয় সেদিন রোজার দিন। মধ্যরাত্রির পরেও কয়েক ঘণ্টা না গেলে আকবর খেতে পারবেন না। রাজপ্রাসাদের সূপকাররা সন্ধ্যাবেলা নানা খাদ্য প্রস্তুত করে রেখেছে, সোনারুপোর থালাতে সে-সব সাজিয়ে তারা অপেক্ষা করছিল কখন রোজা ভাঙবে।

আকবরের সামনে যখন খাদ্য পরিবেশন করা হল তখনও রাত্রি শেষ হয়নি। তাড়াতাড়ি সত্ত্বেও খেতে গিয়ে হঠাৎ বানারসি দাসের কথাগুলি তাঁর মনে পড়ল : "মাংস এবং পানীয়ের বিষয়ে সতর্ক থাকবেন।" খুব সতর্কভাবে সামনের থালা পরীক্ষা করতেই দেখতে পেলেন সেটি লাল পিঁপড়েয় ভরতি। সর্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও এই পিঁপড়েগুলি সম্রাটের খাদ্য-দ্রব্যে ঢুকে সেগুলি নষ্ট করেছিল।

আকবর থালাগুলি ফিরিয়ে দিলেন। এই ঘটনার পর থেকে তিনি যে মূল্যবান উপদেশ পেয়েছিলেন তার গুরুত্ব আরো বেড়ে গেল তাঁর মনে।

তোমরা জান যে বানারসি দাস আকবরকে শুধু লাল পিঁপড়ের বিরুদ্ধেই সাবধান করতে চাননি; অধিকন্তু তাঁর আহার্যের মধ্যে যা কিছু শরীর ও

মনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সে সবেরই বিরুদ্ধে। অস্বাস্থ্যকর খাদ্য থেকে বহু রকমের রোগ জন্মে।

যে মতলববশতঃ খারাপ জিনিস বিক্রি করে সে তার সহনাগরিকদের জীবন-সংশয় ঘটাবার দারুণ অপরাধে অপরাধী। আর শুধু ভেজাল দেওয়া এবং পচা জিনিসগুলিই খারাপ নয়, অধিকন্তু যা ব্যবহারে যে রকমেই হোক শরীরের অপকার হতে পারে সে-সব জিনিসই খারাপ।

গল্পে অবশ্য জানা গেল না আকবর তাঁর পেয়ালাতেও লাল পিঁপড়ে পেয়েছিলেন কি না। তবু বানারসি দাস তাঁকে বলেছিলেন পানীয় সম্বন্ধে সাবধান হতে।

যে পেয়ালাগুলো ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল, মনে হয় যেন তার মধ্যে মধুর এবং বলকারক পানীয়, বাস্তবিকপক্ষে সেগুলি মানুষের পক্ষে বিপদে পরিপূর্ণ। এ ধরনের পানপাত্রের মধ্যে প্রধান হল যার মধ্যে রয়েছে মাদকদ্রব্য।

*

* *

হজরত মহম্মদ বলেছিলেন মদ খাওয়া এবং জুয়াখেলা পাপ। বস্তুতঃ যাঁরা কোরানের বাণী মানেন তাঁরা মদ্যপান ও জুয়াখেলা থেকে বিরত হন, এবং তাতে তাঁদের লাভই হয়।

তেমনি অন্যদিকে আবার এমন লোক আছেন যাঁরা এসব পানীয় গ্রহণ অন্যায় বলে মনে করেন না। তাঁদের মতামতের মূল্য আমরা বুঝি। তবু মদ না খাওয়া দোষের তেমন কথাও কিন্তু এঁরা জোর গলায় বলতে পারেন না।

তাহলে একদিকে একদল লোক ভাবছেন উত্তেজক পানীয় গ্রহণ ক্ষতিকর, আর অন্যদিকে বিপরীত পক্ষ বলছেন তা গ্রহণ করা ভাল, কিন্তু এমন লোক মিলবে না কখনো যাদের মত হল মদ্যপান না করাই দোষের। তর্ক চলতে পারে সুরাপান আবশ্যক কি না, কিন্তু কেউই একথা স্বীকার করতে ইতস্ততঃ করবেন না যে এ-বস্তু না খেলেও কোনো ক্ষতি হয় না। অধিকন্তু সকলেই বলবে এটি ত্যাগ করলে প্রচুর সাশ্রয় হয়।

সব দেশেই মদ্যপান-নিবারণী সঙ্ঘ-সমিতি দেখা যায়, তাদের সভ্যরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে সুরা স্পর্শ করবে না। কোনো কোনো শহরে মদ বিক্রি এমনকি আইনত নিষিদ্ধ।

কোথাও আবার ঠিক উল্টোটি ঘটছে। আগে যেখানে মদ ছিল অপরিচিত এখন সেখানে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করছে। দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষ। কত শতাব্দী ধরে সংযম নিবৃত্তি যে-দেশে প্রধান ধর্ম ছিল এখন সেদেশে পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত দৈত্যদানার চেয়েও ভয়ঙ্কর এই মদের প্রচলন হয়েছে। ভয়ঙ্কর এই জন্য যে রূপকথা-বর্ণিত রাক্ষসরা শুধু শরীরেরই ক্ষতি করতে পারত কিন্তু মাদকের ক্রিয়া চিন্তাশক্তি এবং চরিত্র পর্যন্ত ধ্বংস করতে সক্ষম। মদ প্রথমে

শরীরের ক্ষতি করে, তারপর যে পিতামাতা অত্যধিক পান করে তাদের সন্তানদেরও আক্রমণ করে; মানুষের বুদ্ধির বিনাশ ঘটায়, যাদের হওয়া উচিত বিশ্বমানবের সেবক তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করে।

সত্যসত্যই আমাদের প্রত্যেককে বিশ্বমানবের সেবক হতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে খাদ্য এবং পানীয়ের ত্রুটির ফলে আমরা যদি শরীর কিংবা মনকে দুর্বল করে ফেলি, তাহলে আমরা শুধু নিকৃষ্ট সেবকেই পরিণত হব না, কর্তব্য সম্পাদনে নিজেদের অযোগ্যতাও প্রমাণ করব।

সৈন্যের যখন হাত ভেঙে যায়, নাবিকদের নৌকা থেকে যখন মাস্তুল ভেঙে যায়, অশ্বারোহীর অশ্ব যখন খোঁড়া হয়ে যায় তখন তাদের কি অবস্থা? আর মানুষ যদি তার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বৃত্তিগুলি হারায় তবে আর কি থাকল?

তখন সে একটা সুস্থ জন্তুরও অধম, কারণ এই জন্তুটিও জানে কি খাদ্য কি পানীয় খেলে তার ক্ষতি হবে।

রোমক কবি ভর্জিল খোলা মাঠে বাস করতে ভালবাসতেন। তিনি গুণগান করেছেন সেই সবল মহিষটির যে লাঙল টেনে ভূমি কর্ষণ করে চলেছে, যে-মাটির মধ্য থেকে দেখা দেবে ভবিষ্যতের ফসল। সুদৃঢ় মহিষের দেহ, শক্তিমান তার পেশীগুলি, বছরের পর বছর ধরে কঠিন তার শ্রম।

ভর্জিল আরো বলেছেন :

—"সুরা এবং ভোজনবিলাস তার অপরিচিত। ঘাস খেয়ে তার জীবন, স্রোতস্বিনী নদী এবং স্বচ্ছ ঝরনার জলে তার তৃষ্ণা নিবারণ; কোনো দুশ্চিন্তা তার নির্বিঘ্ন নিদ্রার ব্যাঘাত করে না।"

শক্তিমান হতে হলে সংযত হও।

রাগ করতে পার বরং কেউ যদি তোমায় বলে : "দুর্বল হও।"

সংযম শক্তিমানের শক্তি বর্ধিত করে, আর দুর্বলের শক্তি সংরক্ষণ করে।

বানারসি দাসের উপদেশ মনে আছে কি :

"থালা সম্বন্ধে সাবধান থাকবেন।
গেলাস সম্বন্ধে সাবধান থাকবেন।"

সাবধানতা

—"চমৎকার লক্ষ্যভেদ!" তরুণ যুবক তীর নিক্ষেপে লক্ষ্যবিদ্ধ করতেই একজন বলে উঠল।

—"হ্যাঁ" আর একজন বলল, "কিন্তু এখন পরিষ্কার দিবালোক। ধানুকী দেখে লক্ষ্য স্থির করতে পারে। দশরথের মত কুশলী এ নয়।"

—"দশরথ তবে কি করেন?"

—"শব্দভেদী তাঁর নাম।"

—"তার অর্থ?"

—"তিনি শব্দ শুনেই লক্ষ্য স্থির করেন।"

—"পরিষ্কার করে খুলে বলো।"

—"মোটকথা তিনি অন্ধকারে শর নিক্ষেপ করতে পারেন। রাত্তিরে জঙ্গলের মধ্যে কান পেতে থাকেন; পায়ের অথবা পাখার শব্দে সেটা কোন্ প্রাণী স্থির করে তিনি তীর ছোঁড়েন—এমন নির্ভুলভাবে যেন স্পষ্ট দিবালোকে সব দেখে ছুঁড়েছেন।"

অযোধ্যাপুরীর রাজপুত্র দশরথের এই সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

শব্দভেদী বলে নিজের কুশলতায় গর্বিত এবং লোকের প্রশংসায় মুগ্ধ ছিলেন তিনি। সন্ধ্যার আবছায়া আলোতে রাজপুত্র বেরিয়ে পড়তেন গভীর বনে মৃগয়ার লক্ষ্যস্থলে। কখনো কানে আসে পানার্থী মহিষ অথবা হস্তীর পদশব্দ। কখনো হরিণীর লঘু পদক্ষেপ অথবা ব্যাঘ্রের নিঃশব্দ পদসঞ্চার।

একদা রাত্রিকালে কতকগুলি ঝোপের মাঝখানে শুয়ে আছেন, গাছের পাতার আর জলের শব্দ শুনছেন। এমন সময় হঠাৎ কানে এল কি একটা প্রাণী পুকুরের ধারে নড়াচড়া করছে। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। তা হলই বা, দশরথ কি শব্দভেদী নন? শব্দই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট : ওটা যে একটা হাতি তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। তিনি তীর ছুঁড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা চীৎকার চারদিক মথিত করে উঠল : "বাঁচাও! বাঁচাও! আমায় মেরে ফেললে!" চমকে লাফিয়ে উঠলেন তিনি।

দশরথের হাত থেকে ধনুক খসে পড়ল; একটা দারুণ ভয়ে তাঁর মাথা ঘুরে গেল। কি করলেন তিনি? বন্য জন্তুর পরিবর্তে একজন মানুষকে নিহত করলেন? জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পুকুরের ধারে ছুটে গেলেন। দেখলেন, পাড়ে একটি যুবক নিজের রক্তস্রোতের মধ্যে পড়ে রয়েছে—ছড়ানো চুল, জলের কলসীটি হাতে ধরে।

—"মহারাজ," অতিকষ্টে বলল সে, "আপনিই প্রাণঘাতী এই তীর ছুঁড়েছেন? আমি আপনার কি অনিষ্ট করেছি যে আপনি আমার এই অবস্থা

করলেন? আমি এক মুনির একমাত্র পুত্র। আমার বৃদ্ধ পিতামাতা অন্ধ, আমি তাঁদের দেখাশোনা করি এবং প্রয়োজনের জোগান দিই। তাঁদেরই জন্য জল নিতে এসেছিলাম। এখন আমি আর তাঁদের সেবা করতে পারব না। এই রাস্তা দিয়ে ওই কুটিরে যান, তাঁদের কাছে গিয়ে যা ঘটেছে বলুন। কিন্তু তার আগে আমার বুক থেকে এই শলাকাটি তুলে দিয়ে যান, এতে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।"

দশরথ ক্ষতস্থান থেকে তীরটি তুলে ফেললেন। তরুণ বালক শেষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রাণত্যাগ করল।

রাজপুত্র কলস জলপূর্ণ করে মুমূর্ষুর প্রদর্শিত পথ ধরে চললেন। কাছে আসতেই পিতা ডাকলেন :

—"বাছা, এত দেরী হল কেন? পুকুরে স্নান করছিলে, তাই কি? আমরা ভাবছিলাম তোমার কোন বিপদ ঘটল না তো? কিন্তু তুমি উত্তর দিচ্ছ না যে?"

কম্পিতকণ্ঠে দশরথ বললেন :

"হে পুণ্যাত্মা মুনি, আমি আপনার পুত্র নই। জনৈক ক্ষত্রিয় আমি। এই মুহূর্ত পর্যন্ত শরসন্ধানে দক্ষতার জন্য আমার অহঙ্কার ছিল। আজ রাত্রিতে শিকারের উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করছিলাম। তখন পুষ্করিণীর পারে হাতি জলপান করছে ভেবে আমি তীর ছুঁড়ি। হায়! আমি যাকে বিদ্ধ করলাম সে আপনারই পুত্র। এখন আদেশ করুন আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি।"

বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা উভয়ে কাঁদতে লাগলেন। তাঁরা রাজপুত্রকে বললেন যেখানে তাদের একমাত্র পুত্রের দেহ রয়েছে সেইখানে নিয়ে যেতে। মৃতদেহের উপরে তাঁরা মন্ত্র পাঠ করলেন এবং অন্ত্যেষ্টির পুণ্যবারি সিঞ্চন করলেন।

তারপর মুনি বললেন :

"শোন, দশরথ! তোমার দোষে প্রাণাধিক পুত্রের জন্য আমাদের অশ্রুপাত করতে হল। একদিন তুমিও তোমার প্রিয় পুত্রের জন্য কাঁদবে। ইতিমধ্যে অনেক বছর কেটে যাবে বটে; কিন্তু এ-শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে।"

তাঁরা শবদাহের উদ্দেশ্যে চিতা সাজালেন, তারপর নিজেরাও সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

অনেক দিন যায়। দশরথ অযোধ্যার রাজা হয়েছেন, বিবাহ করেছেন কৌশল্যা দেবীকে। তাঁদের এক পুত্রও হয়েছে—তার নাম রামচন্দ্র।

শুধু দ্বিতীয় রাণী কৈকেয়ী এবং তার দাসী ছাড়া রামচন্দ্র আর সকলেরই প্রিয়পাত্র। এই দুটি রমণী মহানুভব রামের সর্বনাশ সাধনের উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। এদের চক্রান্তে রামকে চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে যেতে হল।

তখন পুত্রের জন্য দশরথ কাঁদতে লাগলেন, ঠিক যেমন একদিন অরণ্যে দুই বৃদ্ধ পিতামাতাকে মধ্যরাত্রিতে পুষ্করিণীর তীরে মৃত তরুণ সন্তানের জন্য কাঁদতে হয়েছিল, তেমনিভাবে।

পূর্বে দশরথ তাঁর কুশলতার জন্য এত গর্বিত ছিলেন যে তাঁর সাবধানতা ছিল না এবং অন্ধকারে যে কোন মানুষকেও আঘাত করে বসতে পারেন তেমন বিপদের কথা ভাবতেও পারেননি। শব্দভেদী হবার দক্ষতায় মূর্খের মত অহঙ্কারী না হয়ে পরিষ্কার দিবালোকে তীর ছুঁড়লেই তাঁর পক্ষে ভাল হত। তিনি কারও ক্ষতি করতে চাননি, কিন্তু অদূরদর্শীর মত কাজ করেছিলেন।

*

* *

দুই বৃদ্ধ শকুনের বড় শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল। তাই দেখে বারাণসী শহরের এক বণিকের দয়া হল। একটা শুকনো জায়গায় নিয়ে গেল দুটিকে, একটু আগুন জ্বালল এবং খেতে দিল মৃত জন্তুদাহের চিতা থেকে আনীত মাংস।

বর্ষা এলে শকুনরা পাহাড়ের দিকে উড়ে চলে গেল, তারা তখন বেশ সুস্থ সমর্থ।

বারাণসীর দোকানীর ওপর কৃতজ্ঞতাপরবশ হয়ে তারা ঠিক করল যে শহরের যেখানে যত জামাকাপড় আছে সব নিয়ে গিয়ে তাদের দয়ালু বন্ধুটিকে দেবে। বাড়ি থেকে বাড়ি, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তারা উড়ে বেড়াতে লাগল, খোলা জায়গায় লোকেরা মেলে দিয়েছে যে কাপড়চোপড় সে-সব তুলে নিল, এনে একেবারে দোকানীর বাড়ি হাজির।

দোকানী তাদের সদুদ্দেশ্যের প্রশংসা করল কিন্তু অপহৃত বস্ত্রগুলি ব্যবহারও করল না, বিক্রিও করল না। সমস্ত সযত্নে সরিয়ে রেখে দিল।

ইতিমধ্যে এই দুটি শকুনের জন্য সর্বত্র জাল পাতা হল এবং একটি ধরাও পড়ল। রাজার কাছে নিয়ে যেতে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন :

—"আমার প্রজাদের জিনিস তুমি চুরি করেছ কেন?"

পাখী উত্তর দিল :



—"একদিন এক দোকানদার আমার এবং আমার ভ্রাতার জীবন রক্ষা করেছিল। ঋণ পরিশোধ করব বলে আমরা এই সব জামাকাপড় সংগ্রহ করেছি।"

সাক্ষ্য দেবার জন্য দোকানদারকেও ডেকে পাঠান হল।

—"ধর্মাবতার," সে বললে, "শকুন দুটি সত্যিই আমায় অনেক জামাকাপড় এনে দিয়েছে। কিন্তু আমি সে-সব তুলে রেখেছি এবং এখন তাদের প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত।"

রাজা শকুনদের ছেড়ে দিলেন তারা কৃতজ্ঞতা-প্রণোদিত হয়ে কাজ করেছিল বলে, যদিও অবিবেচনা ছিল তার মধ্যে; আর দোকানীকেও তার সাবধানতার জন্য বিপন্ন হতে হয়নি।

*

* *

জাপানীদের মধ্যে সাবধানতার আদর্শ চমৎকারভাবে অঙ্কিত হয়েছে।

তাদের একটি মন্দিরে পদ্মের ওপর ধ্যানী বুদ্ধের এক মূর্তি আছে। তার সামনে তিনটি বানর। তাদের একটির দুই হাতে দু'চোখ ঢাকা, আর একটির দুই হাতে দুই কান ঢাকা, তৃতীয়টির দুই হাত মুখের ওপর। এই তিনটি বানর কি নির্দেশ করছে? অঙ্গভঙ্গির দ্বারা প্রথমটি বলছে :

—"খারাপ এবং কুশ্রী জিনিস আমি দেখব না।"

দ্বিতীয়টি :

—"আমি সে-সব শুনব না।"

তৃতীয়টি :

—"আমি সে-সব বলব না।"

জ্ঞানী ব্যক্তি কি দেখেন কি শোনেন কি বলেন সে বিষয়ে সাবধান থাকেন। তিনি পরিণাম চিন্তা করেন, ভবিষ্যতের কথা ভাবেন; যদি পথ ঠিক করতে না পারেন তবে জিজ্ঞাসা করে নেন।

আন্তরিকতা

এক সিংহ, এক নেকড়ে আর একটা শৃগাল একসঙ্গে শিকারে বেরিয়েছিল। তারা মারল একটা গাধা, একটা হরিণ, আর একটা খরগোশ।

শিকার সব সামনে রেখে সিংহ নেকড়েকে জিজ্ঞাসা করল :

—"বন্ধু নেকড়ে, বল তো এই শিকার এখন কি করে আমরা ভাগ করব?"

নেকড়ে উত্তর দিল :

—"জন্তু তিনটে কাটাকাটি করা কি দরকার। আপনি গাধাটা নিন, শেয়াল নিক খরগোশটা, আর এ অধমের হরিণটা পেলেই চলে যাবে।"

উত্তরে সিংহ রাগে শুধু একটা ভীষণ গর্জন করল এবং থাবার এক আঘাতে পরামর্শদানের পুরস্কারস্বরূপ নেকড়ের মাথাটি চূর্ণ করল। তারপর শৃগালকে সম্ভাষণ করে বলল :

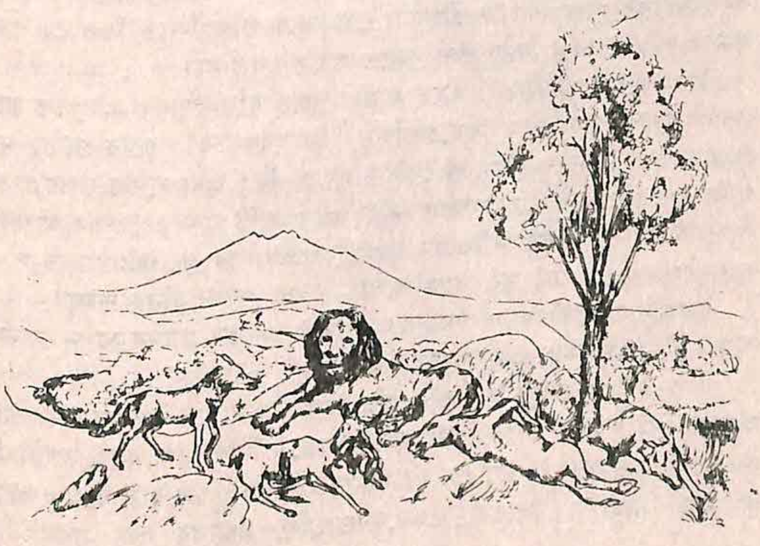
—"আর তুমি দোস্ত, তুমি কি বল?"

—"মহারাজ!" অত্যন্ত বিনয়ভরে শৃগাল বলল, "এ তো খুব সোজা ব্যাপার। আপনি প্রাতরাশের জন্য নিন গাধাটা, সান্ধ্য-ভোজের জন্য হরিণটা, আর উভয়ের মধ্যে খরগোশটা দিয়েই জলযোগ সম্পন্ন করুন।"

—"বেশ, বেশ," সবটা শিকার একাই পেয়ে খুশি মনে বলল সিংহ। "কিন্তু তোমায় এত সুবিচার এবং সুবুদ্ধির সঙ্গে কথা বলতে কে শিখিয়েছে?"

—"আজ্ঞে, ওই নেকড়ে," চতুরতার সঙ্গে উত্তর করল শৃগাল।

শৃগাল কেন ওরকমভাবে কথা বলল? তার সত্যকার মনোভাব প্রকাশের



জন্য? নিশ্চয় নয়! অথবা তার আসল মতলব সিংহকে খুশি করা? না, তাও নয়। সে ওরকম বলেছিল ভয় পেয়ে; এবং সে যে অনেকখানি অনুকম্পার যোগ্য তাও বটে। কিন্তু যথার্থ বলতে গেলে তার কথায় সরলতা ছিল না, ছিল শুধু খলতা। আর সিংহ যদি তা পছন্দ করে থাকে তো তার কারণ সত্যের চেয়ে মাংসই তার কাছে অধিক প্রিয়।

*

* *

আবু আব্বাস নামে একজন মুসলমান লেখক আমাদের কাছে রাজা সলোমনের গৌরব-কাহিনী বলেছেন। সলোমন হিব্রুদের তীর্থস্থান জেরু-সালেমে রাজত্ব করতেন।

তাঁর রাজসভায় ছয় শত আসন ছিল। তার অর্ধেকে পণ্ডিত ব্যক্তিরা বসতেন, বাকী অর্ধেকে বসত জীন বা দানারা—এরা তাদের যাদুশক্তি দিয়ে সলোমনকে সাহায্য করত।

সভা বসলে রাজার হুকুমে একদল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাখী এসে উপস্থিত হত, ডানা মেলে ছ'শ আসনের উপর তারা ছায়া দান করত। তেমনি আবার তাঁর আদেশে জোর হাওয়া উঠত, সমস্ত প্রাসাদটিকে তৎক্ষণাৎ শূন্যে তুলে নিয়ে চলে যেত প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় এবং সকালে একমাস দূরের পথে। এইভাবে রাজা তাঁর রাজ্যের দূরদেশগুলি নিজে উপস্থিত থেকে শাসন করতেন।

তাছাড়া সলোমন এত অপরূপ এক সিংহাসন তৈরি করিয়েছিলেন যে কল্পনাও করা যায় না। সিংহাসনটি এমনভাবে পরিকল্পিত ছিল যে রাজার সামনে দাঁড়িয়ে কেউ মিথ্যা কথা বলতে সাহস পেত না।

সিংহাসনটি গজদন্তের, তাতে মুক্তা মরকত চুনি বসান। চারপাশে চারটি সোনার খেজুরগাছ, তার খেজুরগুলিও চুনি মরকতের। এদের ভেতর দুটি খেজুরগাছের উপর কতকগুলি সোনার ময়ূর, আর অন্য দুটির উপর কতক-গুলি সোনার শকুন। সিংহাসনের দুই পাশে দুটি মরকতস্তম্ভের মাঝখানে কয়েকটি সোনার সিংহ দাঁড়িয়ে। খেজুর গাছগুলির গা আগাগোড়া সুবর্ণ আঙুরলতায় জড়ানো, তা থেকে ঝুলছে গুচ্ছে গুচ্ছে চুনির দ্রাক্ষা।

ইজরাইলের প্রবীণরা সলোমনের ডান দিকে বসতেন, তাঁদের আসন সোনার। দানারা বাঁ দিকে বসত, তাদের আসন রুপার।

রাজা বিচারে বসলে লোকদের তাঁর সামনে আনা হত। যখনি কোন ব্যক্তি অপরের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সামান্য কিছুও মিথ্যে কথা বলত তখনি এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটত। তাঁর চোখের সামনে মুহূর্তে সচল হয়ে ঘুরতে থাকত রাজাসহ সিংহাসন, সিংহরা, খেজুরগাছগুলি, ময়ূরের দল, শকুনগুলি।

তারপর সিংহরা সম্মুখে নখ বের করে থাবা নাড়ত, মাটির ওপর লেজ আছড়াত। শকুন আর ময়ূররা তাদের ডানা ঝাপটাত। ফলে ভয়ে কম্পমান সাক্ষীর আর মিথ্যে কথা বলার সাহস হত না।

ব্যাপারটা আগাগোড়া বেশ সুবিধারই ছিল, রাজার কাজও এতে অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভয় সর্বদাই একটা হেয় জিনিস, সত্যের সঙ্গে তার বনিবনাও তেমন নেই।

আবু আব্বাসের গল্পে দেখেছি যে হঠাৎ ভয় মানুষকে জোর করে সত্যি কথা বলায় বটে কিন্তু তা দিয়ে তাকে সত্যবান করে তোলে না; যেহেতু পর-মুহূর্তে একই কারণে সে করতে পারে কপট আচরণ, যেমন পূর্ববর্তী গল্পে শৃগালের দৃষ্টান্তে দেখেছি। আর এই রকমই সচরাচর ঘটে থাকে।

সাধু ব্যক্তির সত্যকথা বলার জন্য প্রয়োজন হয় না সলোমনীয় সিংহাসনের ভোজবাজী। সত্যের সিংহাসন তার নিজেরই অন্তরে প্রতিষ্ঠিত। তার আত্মার শুদ্ধতা তাকে শুধু সৎ কথা বলতেই প্রেরণা দেয়। সে যে সত্যকথা বলে তা কোনো শিক্ষক, মনিব অথবা শাসনকর্তার ভয়ে নয়, বলে কারণ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে তা স্বভাবধর্ম বলে, সেটি তার চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য।

সত্যের উপর তার এই অনুরাগ তাকে সব ভয়ের সম্মুখীন হবার সাহস দেয়। যা উচিত তাই সে বলে, তাতে যাই ঘটুক না কেন।

*

* *

বিশ্বামিত্র নামে এক সম্পদশালী শক্তিমান রাজা ছিলেন। তিনি অধিকতর যশ লাভের জন্য তপস্যা করতে কৃতসংকল্প হলেন—চাইলেন তপশ্চর্যা দ্বারা নিজের ক্ষত্রিয়বর্ণ অতিক্রম করে সর্বশ্রেষ্ঠ যে ব্রাহ্মণবর্ণ তা-ই লাভ করতে।

সেজন্য যা যা তাঁর করা দরকার মনে হল সে-সবই তিনি করলেন। বাহ্যতঃ কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনও করলেন। তা দেখে সকলে বলতে লাগল: "রাজা ব্রাহ্মণত্ব লাভেরই উপযুক্ত।"

ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ কিন্তু সেরকম ভাবলেন না। তিনি জানতেন বিশ্বামিত্র অহংকার-প্রণোদিত হয়ে কাজ করছেন। তাঁর ত্যাগ আন্তরিক নয়। সেই জন্য তিনি তাঁকে ব্রাহ্মণ নামে অভিনন্দিত করতে অস্বীকার হলেন।

রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে বশিষ্ঠের বংশের একশতটি সন্তান হত্যা করলেন। কিন্তু এত দুঃখ সত্ত্বেও বশিষ্ঠ যা সত্য বলে মানেন না তা বলতে রাজী হলেন না।

তখন রাজা এই সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে হত্যা করতে মনস্থ করলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁর এই অসৎকর্ম সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি বশিষ্ঠের কুটিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

দরজার কাছে এসে শুনতে পেলেন ব্রাহ্মণ তাঁর সহধর্মিণীর সঙ্গে কথা বলছেন। রাজা তাঁর নাম উচ্চারিত হতেই শোনবার জন্য দাঁড়ালেন। যে কথা

তাঁর কানে এল তা সাধু শুদ্ধ, তাঁর ওপর ক্ষমায় পরিপূর্ণ। রাজার অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। অনুশোচনায় তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন অস্ত্র। ঘরে প্রবেশ করে ঋষির পদতলে লুটিয়ে পড়লেন।

—"ব্রহ্মর্ষি", রাজার মনের অবস্থা জ্ঞাত হয়ে প্রীতিভরে সাদরে ডাকলেন বশিষ্ঠ।

—"প্রথমে কেন তবে আপনি আমার তপস্যা স্বীকার করেন নি?" সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন বিশ্বামিত্র।

—"কারণ তখন আপনি ব্রাহ্মণ হতে চেয়েছিলেন অহংকারের শক্তি নিয়ে। এখন আপনার অনুশোচনা এসেছে, আপনি সত্যকার ব্রাহ্মণোচিত মনোভাব নিয়ে এসেছেন।"

বশিষ্ঠ নির্ভয়ে সত্যকথা বলতেন, আর তা বলতেন বিনা বিদ্বেষে।

*

* *

বুঝলে তো, সত্যকথা বলতে গেলে যখন বিপদের সম্ভাবনা আছে তখনও সত্যকথা বলা কত সুন্দর?

তাছাড়া, যারা এমনিভাবে সাহস করে এ-বিপদের সম্মুখীন হয়, দেখা যায় শেষে সব তাদের অনুকূল হয়ে ওঠে, প্রথমটায় যদিও তার আভাস পাওয়া যায় না। মিথ্যার জয় চিরদিন ক্ষণস্থায়ী। তেমনি আবার অন্যদিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরল হওয়াই কুশলী হবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

একদিন প্রভাতকালে দিল্লীর সম্রাট সিংহাসনে বসে তাঁর বিবেচনায় যোগ্য ব্যক্তিদের সম্মান বিতরণ করছিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হতে চলল, তিনি লক্ষ্য করলেন যাদের তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে সৈয়দ আহম্মদ নামে একজন তরুণ তখনো এসে উপস্থিত হয়নি।

সম্রাট সিংহাসন ছেড়ে উঠলেন, বিস্তীর্ণ প্রাসাদ-ভবনের ভেতর দিয়ে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য যে পালকি তাতে আরোহণ করলেন।

এমন সময় তরুণটি ছুটতে ছুটতে এল।

—"আপনার পুত্রের আসতে দেরী হয়ে গিয়েছে," সম্রাট তাঁর বন্ধু সৈয়দের পিতাকে বললেন।

—"দেরী হল কেন?" যুবকটির দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

—"সম্রাট!" সৈয়দ অকপটে উত্তর দিল, "আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তাই।" সভাসদরা হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল যুবকটির দিকে। কি দুঃসাহস, নির্লজ্জের মত সম্রাটের কাছে বলবার এর চেয়ে ভাল আর কৈফিয়ত খুঁজে পেল না? আর এ কথা বলে কি অবিচক্ষণতারই পরিচয় না দিল!

সম্রাট কিন্তু চুপ করে একটু ভাবলেন, যুবকটির ওপর তাঁর শ্রদ্ধা হল তার

সত্যনিষ্ঠার জন্য। তাকে একছড়া মুক্তার হার দিলেন আর একটি মহার্ঘ মণি মাথায় পরবার জন্য।

এইরূপে সত্যপ্রিয় সৈয়দ আহম্মদ পুরস্কৃত হয়েছিলেন। তিনি রাজপুত্র থেকে চাষী সকলের সামনে সত্যকথা বলতেন।

*

* *

অবশ্য স্বাভাবিকভাবে সত্যভাষণের জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় হল এমন-ভাবে কাজ করা যেন তাতে গোপন করবার কিছুই না থাকে। তার জন্য প্রতি মুহূর্তে আমাদের চলতে হবে এই মনে রেখে, আমরা ভগবানের সামনাসামনি রয়েছি।

কথায় সত্যনিষ্ঠ হতে হলে কাজে সত্যনিষ্ঠ হওয়া দরকার আগে। তাই একনিষ্ঠ লোক হলেন তিনিই যিনি তাঁর বাক্যে সকল মিথ্যা, আচরণে সকল কপটতা পরিহার করে চলেন।

আমরোহা-শহরে 'কাগাজি' বলে রূপালী কাজকরা এক বিশেষ রকমের চিনেমাটির জিনিস তৈরি হয়। এই মৃৎশিল্প দেখতে অতি সুন্দর, কিন্তু এত হাল্কা আর ঠুনকো যে সামান্য ব্যবহারেই ভেঙে যায়। যদিও দেখতে তাদের বেশ কাজের বলেই মনে হয়, আসলে তারা কেবল দূর থেকে তারিফ করবার জিনিস।

অনেক লোক আছে যারা এই কাগাজির মত। দেখতে তারা চমৎকার, কিন্তু পরীক্ষা কর, যে-রকমেরই হোক, দেখবে তাদের সবটাই কেবল বাহার। এদের উপর এক বিন্দুও আস্থা স্থাপন করবে না, কারণ তাদের ভঙ্গুরতা তোমাদের এই বিশ্বাসের ভার সহ্য করতে অক্ষম।

এক ব্রাহ্মণ তার পুত্রকে লেখাপড়া শেখবার জন্য বারাণসীতে এক পণ্ডিতের কাছে পাঠালেন।

বার বছর পরে ছেলেটি তার নিজের গ্রামে ফিরে এল। অনেক লোক ছুটে এসে জড়ো হল তার কাছে এই মনে করে যে সে মহা বিদ্বান হয়ে এসেছে। তারা তার সামনে সংস্কৃতভাষায় লেখা একখানা বই রেখে বলল :

—"মহামান্য পণ্ডিতমশায়, শাস্ত্রটি বুঝিয়ে দিন তো আমাদের।"

যুবক একদৃষ্টে বইটি দেখতে লাগল। বস্তুতঃ একটি শব্দও তার বোধগম্য হচ্ছিল না। বারাণসীতে কেবলমাত্র বর্ণপরিচয় ছাড়া আর কিছুই তার হয়নি। তাছাড়া কালো পটে সেখানে অক্ষরগুলি এত বড় বড় করে লেখা থাকত যে রোজ দেখতে দেখতে তার মাথায় একরকমে কিছু ঢুকে গিয়েছিল।

বই সামনে রেখে সে চুপ করে রইল। তার চোখ বেয়ে জল পড়ে আর কি!

—"পণ্ডিতমশায়, আপনার হৃদয় বড় ভাবমুগ্ধ মনে হচ্ছে। বইটির মধ্যে তেমন কি পেলেন বলুন আমাদের," আগন্তুকরা বলল।

—"বারাণসীতে অক্ষরগুলো বড় ছিল কিন্তু এখানকার এগুলি বড়ই ছোট," শেষে বলল সে।

এই পণ্ডিতমশায়টি কাগাজিপাত্রের মতনই নয়?

*

* *

গঙ্গার তীরে পাহাড়ের প্রস্তরস্তূপের ওপর একটা নেকড়ে বাস করত। বরফ গলার সময় এলে জল বেড়ে উঠতে লাগল। জল এতটা বেড়ে উঠল যে শেষে নেকড়ের টিলার চারদিক সব ডুবে গেল। তারপর ক্রমে একদিন তার আর খাবারের সন্ধানে বেরুনো সম্ভব হল না।

—"কুছ্ পরোয়া নেই," আহার্য কিছু না পেয়ে সে বলল, "আজকের দিনটি যেন পুণ্যদিন, এদিনের সম্মানার্থে আমি উপবাস করব।"

পাথরের ধারে এক গম্ভীর ভারিক্কি চাল নিয়ে সে বসে রইল, পবিত্র দিনে অনশন যাপন করবে বলে।

ঠিক এমনি সময়ে একটা বুনো ছাগল জলের ওধার থেকে পাথরের পর পাথরে লাফ দিয়ে যে টিলার উপর ভক্তিমান নেকড়ে ছিল সেখানে এসে পৌঁছল।

—"হাঃ! হাঃ!" তাকে দেখতে পেয়েই সে বলে উঠল, "এই যে খাবার জিনিস কিছু পাওয়া গেছে।"

ছাগলটার ওপর সে লাফ মারল কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হল। আবার লাফাল, এবারেও ফল তাই। শেষ পর্যন্ত ছাগলটা খরস্রোত পার হয়ে তার কাছ থেকে একেবারে পালিয়ে চলে গেল।

—"ঠিক!" আবার অত্যন্ত সাধুর ভান করে বলল নেকড়ে-বাঘটি, "এই পুণ্যদিনে ছাগলের মাংস খেয়ে আর অধর্ম করব না। না, না, আজ উপবাসের দিনে আমার মাংস চাইনে।"

এই নেকড়ের কথায় কি মনে হয়, তার ভক্তি, তার পুণ্যদিনের ওপর শ্রদ্ধা সম্বন্ধে? তার ভণ্ডামি দেখে তোমরা হাসছ কিন্তু কত মানুষের নিষ্ঠা এই নেকড়ের মতন; স্বার্থের খাতিরে তারা ভাল ভাল ভাবের অন্তরালে আশ্রয় নেয় এবং নামমাত্র ধর্মকর্ম করে, কারণ তাদের পাপবৃত্তিকে অবাধ গতিতে চলতে দেওয়ার উপায় নেই বলেই। কিন্তু তোমরা কি ভাবছ তাদের সকল চাতুর্য সত্ত্বেও এই ভণ্ডামি যা ন্যায় এবং সত্য তার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে?

*

* *

হনুমানের বানর এবং ভল্লুক সৈন্যরা প্রভু রামচন্দ্র ও তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মণের জন্য দশানন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।

চারিদিক থেকে সৈন্যদের আক্রমণ-আঘাতে নাস্তানাবুদ হয়ে রাবণ তার মায়াশক্তি প্রয়োগ করল।

ফলে হঠাৎ মন্ত্রের জোরে রাবণের দলে অনেক রাম এবং লক্ষ্মণকে দেখা গেল। বাস্তবিকপক্ষে এসব মিথ্যা মায়ামূর্তি মাত্র। কিন্তু বানর এবং ভল্লুকরা তাদের সত্যি মনে করে একেবারে বিস্মিত হয়ে থমকে দাঁড়াল : তাদের পূজ্য নেতা রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে কি করে তারা যুদ্ধ করবে, গাছ পাথর নিক্ষেপ করবে? তাদের এমনি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাবণের মুখে একটা নিষ্ঠুর আনন্দের হাসি ফুটে উঠল। রামও হাসলেন : কি আনন্দ তাঁর, এমন মিথ্যাকে তিনি ধ্বংস করতে যাচ্ছেন, এই প্রবঞ্চনার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করতে, সত্যকে জয়যুক্ত করতে তিনি চলেছেন! নিজের মহাবল ধনুকে তীর সংযোজনা করে তিনি তা আকর্ষণ করলেন। বিভ্রান্তকারী অন্ধকারের মধ্যে তীর সশব্দে ছুটে চলল, অমনি সব অন্ধকার মিলিয়ে গেল। তখন হনুমানের সৈন্যরা সব পরিষ্কার দেখতে পেল, আবার সাহস ফিরে এল তাদের।

এই রকম সত্যনিষ্ঠ লোকের প্রত্যেকটি সত্য কথা একটি তীরের মত, তা বহু মিথ্যা এবং কপটতাকে বিনষ্ট করতে সমর্থ।

*

* *

দক্ষিণ-ভারতের রূপকথায় "বেলফুল" নামে এক রাজার চমৎকার কাহিনী আছে। তাঁর হাসি থেকে একরকমের মিষ্টি বেলফুলের গন্ধ বেরুত, তাতে বহুদূর পর্যন্ত আমোদিত হত। তবে তা ঘটত শুধু তখন যখন তাঁর হাসি অন্তরের স্বাভাবিক আনন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত পুলক হতে উৎসারিত হত। সত্যকার আনন্দ বিনা হাসতে চেষ্টা করাও তাঁর পক্ষে ব্যর্থ হয়ে পড়ত। কেবল যখন তাঁর অন্তর উৎসবে ভরপুর তখনই তাঁর হাসিও সুরভিত ঝরনার মত উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ত।

হাসির এই গুণের একমাত্র হেতু তাঁর আন্তরিকতা।

*

* *

দুর্যোধনের প্রাসাদে আহার্যসম্ভারের রাজকীয় পরিবেশন হত। পাত্রগুলিও ছিল সোনার এবং রুপার, তাতে চুনি, মরকত, হীরের কাজ করা—দ্যুতি ঠিকরে পড়ত এসব থেকে। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানকার উৎসবে আমন্ত্রিত হয়েও গেলেন না। তার পরিবর্তে সেই রাত্তিরে এক যে দরিদ্র শূদ্র তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিল তারই গৃহে খেতে গেলেন। খাবার জিনিস অত্যন্ত সাধারণ, বাসন-কোসনের ব্যবস্থাও অত্যন্ত সাধারণ। কৃষ্ণ তবু এরই বেশি মূল্য দিলেন। কারণ শূদ্রের নিমন্ত্রণের সঙ্গে ছিল আন্তরিকতা ও ভালবাসা। অপরপক্ষে দুর্যোধন যে মহাভোজের আয়োজন করেছিলেন তা শুধু জাঁক দেখাবার জন্য।

আরও কথিত আছে যে রামচন্দ্র একদিন এক ব্যাধের দরিদ্র পত্নীর কাছে

আহারে বসেছেন। রমণীটি মহাবীর রামচন্দ্রের জন্য কয়েকটি মাত্র ফল এনে দিল, তার কাছে আর কিছুই ছিল না। যা-কিছু তার সবচেয়ে ভাল ছিল তা সে দিয়ে দিল এত দরদের সঙ্গে—রামচন্দ্র মুগ্ধ হলেন। আন্তরিক সরল হৃদয়ের এই দান স্মৃতি থেকে যে মুছে যায় তা চাননি তিনি। তাই কত যুগ পরেও আজ লোকে তার কথা বলে।

জালাল একজন প্রসিদ্ধ জ্ঞানী শিক্ষক ছিলেন। একদিন দুজন তুর্কী তাঁর উপদেশ শোনবার জন্য এল, সঙ্গে কিছু দক্ষিণাও এনেছিল। তারা যেমন গরীব, তাদের অর্ঘ্যও তেমনি : মাত্র একমুষ্টি কলাই। শিক্ষকের কয়েকজন ছাত্র অবজ্ঞার চোখে উপহারের দিকে তাকাতে লাগল। জালাল তাদের বললেন :

—"একবার হজরত মহম্মদের একটা অভিযান সুসমাপ্ত করতে গিয়ে কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তাদের তিনি যে যা পারে দিতে বললেন। অনেকে নিজের সঞ্চয়ের অর্ধেক, অনেকে এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে এল। আবু বক্‌র্‌ তার সমস্ত সম্পদই দিয়ে দিল। এমনি করে মহম্মদের অনেক অস্ত্র এবং পশু যোগাড় হল। তারপর এল এক গরীব বৃদ্ধা, মহম্মদকে তিনটে খেজুরফল ও একখানি গমের রুটি দিতে। আর ঐটুকুই ছিল তার যথাসম্বল। এই দৃশ্য দেখে অনেকে হেসে উঠল। কিন্তু মহম্মদ তাদের লক্ষ্য করে বললেন যে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেছেন, দেবদূতরা একটা দাঁড়িপাল্লা ধরে রয়েছে—সকলের ধনরত্ন একদিকে চাপান হয়েছে, আর একদিকে দরিদ্র রমণীর রুটি এবং খেজুর কটি। আশ্চর্য, দাঁড়িপাল্লার কাঁটা স্থির, কারণ এদিকের থালাটি ওদিককারটার সমান ভারী।" জালাল আরো বললেন :

—"আন্তরিক হৃদয় দিয়ে দান করলে সামান্য নিবেদনও মহার্ঘ উপহারের সমান মূল্যবান হয়ে ওঠে।"

এই কথা শুনে তুর্কী দুজন পরম খুশি হল, একমুঠো কলাই দেওয়ার জন্য তাদের দিকে বিদ্রূপের হাসি হাসতে আর কারোর সাহস হল না।

*

* *

একটি নীচ জাতের দরিদ্র লোক তার স্ত্রীপুত্রের জন্য আহার সংগ্রহের চেষ্টায় সারাদিন ঘুরেও কিছু শিকার পেল না। রাত হল, তখনো সে বনের মধ্যে একাকী, ক্ষুধার্ত, বিপুল প্রয়াসের ফলে পরিশ্রান্ত। একটা পাখীর বাসার সন্ধান মিলতে পারে এই আশায় সে একটা বেলগাছ বেয়ে উঠল। ত্রিফলক বিল্বপত্র দিয়ে ভক্তরা শিবপূজা করে। কিন্তু সেখানে কোন পাখীর বাসার দেখা মিলল না। তার মনে পড়তে লাগল স্ত্রীর কথা, তার ছোট শিশুপুত্রদের কথা, যারা আহারের জন্য বাড়িতে তার অপেক্ষা করছে আর কাঁদছে।

পুরাকথায় বলে করুণার অশ্রু বড় ভারী। নিজের দুঃখে ফেলা চোখের জলের চেয়ে সেটি অনেক বেশি মূল্যবান।

ব্যাধের অশ্রু বেলগাছের পাতার উপর বর্ষিত হতে লাগল এবং পত্রসহ বেলগাছের তলায় শিবপূজার উদ্দেশ্যে স্থাপিত প্রস্তরখণ্ডটির উপর গিয়ে পড়ল। এমন সময় একটা সাপের কামড়ে ব্যাধের মৃত্যু হল। তৎক্ষণাৎ অশরীরী দূতরা তার আত্মাকে দেবলোকে নিয়ে গিয়ে শিবের সামনে উপস্থিত করল।

—"এই আত্মাটির জন্য এখানে কোনো স্থান নেই," স্বর্গের অধিবাসীরা সবাই একবাক্যে বলে উঠল। "কারণ এ নীচজাতসম্ভূত, ব্রতধর্ম মেনে চলেনি, অশুদ্ধ আহার গ্রহণ করেছে, দেবতাদের প্রাপ্য অর্ঘ্যও দেয়নি।"

কিন্তু শিব তাদের বললেন :

—"ও আমায় বিল্বপত্র দিয়েছে আর তা ছাড়া আমায় নিবেদন করেছে অন্তরের অশ্রু। সরল হৃদয়ের নীচু জাত বলে কোন শ্রেণী নেই।" অতঃপর তিনি তাকে স্বর্গে স্থান দিলেন।

*

* *

এই সব গল্পে দেখতে পাওয়া যায় যে সর্বকালে সর্বদেশে মানুষ এবং তাদের দেবতারাও আন্তরিকতার মূল্য দিয়েছে।

যে মিথ্যার মধ্যে বাস করে সে বিশ্বমানবের শত্রু।

মানুষের সকল রকম জ্ঞানশাস্ত্র—দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা হল সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা। তবে বৃহত্তর জিনিসগুলির মধ্যেও যেমন, ক্ষুদ্রতম জিনিসটির মধ্যেও তেমনই সত্যের প্রয়োজন আছে।

বালকবালিকাগণ, সত্যনিষ্ঠ হবার জন্য বড় হয়ে ওঠার অপেক্ষা ক'রো না। ও-জিনিস আদৌ ফেলে রাখবার মত নয়—যত আগে থেকে ও-অভ্যাস করে রাখা যায় ততই ভাল।

ইচ্ছা থাকলেও সত্যকথা বলা মানুষের পক্ষে কত কঠিন; কারণ সত্যকথা বলতে গেলে সত্যকে আগে জানা দরকার, তাকে আবিষ্কার করা দরকার। আর এ কাজ সব সময় সুবিধার নয়।

*

* *

বারাণসীর চার রাজপুত্র, তারা চার ভাই। প্রত্যেকে গিয়ে তাদের পিতার সারথিকে বলল :

—"আমি কিংশুক গাছ দেখতে চাই।"

—"আচ্ছা, দেখিয়ে আনব," বলল সারথি। তারপর একদিন জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে বেড়াতে নিয়ে গেল।

বনের মধ্যে রাজপুত্রকে সে একটা কিংশুক গাছ দেখিয়ে দিল। বছরের

তখন যে-ঋতু তাতে গাছে কি কলি, কি পাতা, কি ফুল কিছুই দেখা দেয়নি। রাজপুত্র দেখল শুধু একটা নীরস কাঠের গুঁড়ি।

কয়েক সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় কুমার রথে চড়ে বেড়াতে গেল এবং কিংশুক-গাছ দেখেও এল। সে দেখল গাছটি পাতায় পাতায় ছেয়ে গেছে।

সেই ঋতুতে আর কিছুকাল পরে দেখতে গেল তৃতীয় কুমার; গাছটি এবার ফুলে ফুলে আগাগোড়া লাল।

চতুর্থ রাজপুত্র সকলের শেষে দেখল গিয়ে; গাছের ফলগুলি তখন পরিপক্ক।

একদিন তারা চার ভাই যখন একত্র হয়েছে তখন একজন লোক তাদের জিজ্ঞাসা করল :

—"কিংশুক গাছ কি রকম?"

জ্যেষ্ঠ কুমার বলল : "একটা নেড়া কান্ডের মত।"

দ্বিতীয় কুমার : "পাতাভরা কলাগাছের মত।"

তৃতীয় কুমার : "গোলাপী এবং লাল একটা ফুলের তোড়ার মত।"

চতুর্থটি বলল : "বাবলা গাছে ফল ধরলে যেমন হয়।"

সকলে একমত হতে না পারাতে বিচারের জন্য তাদের পিতা মহারাজের কাছে গেল। কি করে একের পর অন্যে রাজপুত্ররা কিংশুক গাছ দেখেছিল জানতে পেরে রাজা হাসলেন। তারপর তাদের বললেন :

—"তোমাদের চারজনই ঠিক। কিন্তু তোমরা চারজনই ভুলে গিয়েছ যে গাছটি সব ঋতুতেই এক রকম থাকে না।"

প্রত্যেকেই নিজে যা দেখেছে তাই শুধু বলেছে এবং প্রত্যেকেই অপরের জ্ঞানকে অবজ্ঞা করেছে।

এইরূপে প্রায়ই মানুষ সত্যের একটুখানি অংশ জানে, আর তাদের ভ্রম ঘটে এই থেকে যে তারা সেইটুকুর মধ্যে সব জেনে ফেলেছে মনে করে।

এই ত্রুটি কত কমে যেত যদি মানুষ প্রথম থেকেই সত্যের অনুরাগী হতে শিখত, আরো এবং আরো সত্য আবিষ্কারের জন্য।

*

*   *

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল কুমায়ুন। সেখানকার রাজা একদিন আলমোড়ার পাহাড়ে শিকারে বেরিয়েছেন। পাহাড় তখন গভীর অরণ্যে ভরা।

ঝোপ থেকে একটা খরগোশ ছুটে চলে গেল। রাজা তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন। হঠাৎ খরগোশটা একটা বাঘের রূপ নিল এবং নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই অলৌকিক ঘটনা রাজার মনে গভীর রেখাপাত করল। তিনি রাজ-

পণ্ডিতদের সবাইকে তাঁর প্রাসাদে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন এই ঘটনার অর্থ কি।

—"এর তাৎপর্য হল," তাঁরা বললেন, "যেখানে বাঘটি আপনার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়েছে সেখানে একটি নূতন নগর নির্মাণ করা উচিত। কারণ বাঘেরা জনবহুল বসতির কাছ থেকে পালিয়ে যায়।"

নূতন নগর তৈরি করতে শ্রমিক লাগান হল। জমির দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্য একটা মোটা লোহার শলাকা মাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হল। তখন হঠাৎ মাটি একটুখানি কেঁপে উঠল।

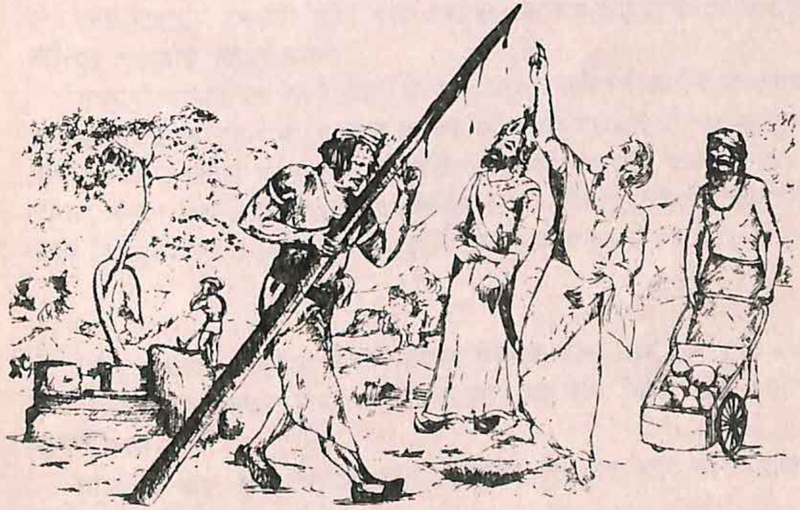
—"থাম!" চিৎকার করে উঠলেন পণ্ডিতরা, "শলাকার অগ্রভাগ পৃথিবী-বাহক শেষনাগকে বিদ্ধ করেছে। এখানে আর শহর তৈরি চলবে না।"

কাহিনীতে বলে সত্যসত্যই লৌহদণ্ডটি মাটি থেকে তুললে দেখা গেল সেটা শেষনাগের রক্তে আগাগোড়া লাল।

—"মহা বিড়ম্বনা হল দেখছি," বললেন রাজা, "কিন্তু যেহেতু একবার ঠিক করেছি যে এখানে নগর নির্মাণ হবে তখন যাই ঘটুক না কেন নগর নির্মাণ করবই।"

ক্রুদ্ধ হয়ে পণ্ডিতরা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে এই শহরবাসীদের কপালে ভীষণ দুর্ভোগ আছে, অচিরে রাজার নিজের বংশও লোপ পেয়ে যাবে।

জমি ছিল উর্বর, জল ছিল সেখানে প্রচুর। ছয় শত বছর ধরে আলমোড়ার এই নগরটি পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, চতুর্দিকের জমিতে ফলছে অপর্যাপ্ত ফসল।



দেখা গেল পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও পণ্ডিতরা ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অবশ্য একথা ঠিক যে তাঁরা অকপট ছিলেন, মনে ভেবেওছিলেন যা সত্যি তা-ই তাঁরা বলছেন কিন্তু অনেক সময়েই মানুষ এমনি ভুল করে এবং ভুলকেই সত্য বলে গ্রহণ করে, বাস্তবিক যা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা! পৃথিবী কুসংস্কারে ভরে গিয়েছে, সত্য হতে অধিকতর সত্য আবিষ্কারের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে-উপায় মানুষকে নির্দেশ করা যেতে পারে তা হল নিজে সর্বদা একনিষ্ঠ থাকা, ক্রমেই বেশি একনিষ্ঠ হয়ে ওঠা—চিন্তায়, কর্মে, বাক্যে; যেহেতু কখনো কোথাও অপরকে না প্রবঞ্চনা করে চললে নিজেকেও ক্রমে প্রবঞ্চনার হাত থেকে মুক্ত করে তোলা যায়।

সুবিচার করতে হলে

সোজা দেখে একটা কাঠি বেছে নাও; অর্ধেকটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে দাও: কাঠিটা মনে হবে যেন মাঝখানে বেঁকে গিয়েছে। ওটা মিথ্যা আকার; তুমি যদি মনে করে থাক কাঠিটা ঠিকঠিকই বাঁকা, তোমার সিদ্ধান্ত ভুল। কাঠিটা আবার তোল, দেখতে পাবে, বস্তুতঃ ওটি বরাবরই সোজা।

তেমনি আবার মাঝখানে সত্যিসত্যি বাঁকা একটা কাঠিকে কৌশলের সঙ্গে বিশেষভাবে জলের মধ্যে ডুবিয়ে ধরলে তাকে সোজা বলে দেখান যায়।

বলতে কি, অনেক সময়ে মানুষরাও এই কাঠিরই মত। বাঁকা চোখে দেখলে তারা সোজা হলেও ঠিক তেমন দেখায় না; আবার অনেক সময়ে লোক-ঠকানো রূপ গ্রহণ করে তারা এবং আসলে বাঁকা হলেও দেখায় সোজা। সেইজন্য বাইরের আকারের ওপর যত কম নির্ভর করে চলা যায় ততই ভাল, আর লঘুভাবে কোনো মানুষকে বিচার করা উচিত নয়।

ভারতবর্ষে কোনো এক স্থানে এক সন্ন্যাসী ভিক্ষা সংগ্রহে যাচ্ছিল। পথে মাঠের মধ্যে একটি ভেড়ার সঙ্গে তার দেখা। রোষান্বিত জন্তুটি সন্ন্যাসীকে গুঁতোবার উপক্রম করতে লাগল এবং সেই উদ্দেশ্যে মাথা নীচু করে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

ধার্মিক লোকটি বলল:

—"আহা! কি ধর্মজ্ঞান আর সুবুদ্ধি জানোয়ারটির। ও বুঝতে পেরেছে আমি কি গুণী ব্যক্তি; তাই আমাকে প্রণাম করার জন্য আমার সামনে একেবারে আনত হয়ে আসছে।"

সেই মুহূর্তে ভেড়াটা ছুটে এল এবং মাথার এক গুঁতো খেয়ে সাধুটি মাটিতে গড়াগড়ি যেতে লাগল।

সম্পূর্ণ অযোগ্য যে তাকে অতিরিক্ত শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস দিয়ে বিচার করলে এমনই ফল হবার কথা। কারণ এমন লোকও দেখা যায় যারা সুকবি লা ফঁতেন বর্ণিত নেকড়ে বাঘের মত। নেকড়ে বাঘটিকে ভেড়ীর দল মনে করেছিল মেষ-পালক, কারণ তার গায়ে ছিল মেষপালকের জামা। অথবা সেই গর্দভের মত যাকে সিংহের চামড়ায় আবৃত হবার দরুন মনে হয়েছিল ভয়ঙ্কর জন্তু বলে।

*

* *

কিন্তু বাইরের আকৃতির উপর বিশ্বাস করবার ফলে এমন ভুল যদি হয়, তবে অন্য দিকে আবার মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে সরাসরি বিচার করে ফেলি অনেক সময়।

পারস্যের শাহ্ ইসমাইল সেফেভি খোরাসান দেশ জয় করে স্বীয় রাজ-ধানীতে ফিরছিলেন।

কবি হাতিফির বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় রাজার বড় ইচ্ছা হল তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত যাবার মত অপেক্ষা করার আর তর সইল না। এমন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার বাসনা এত প্রবল হল যে দেয়ালের ওপর দিয়ে একটা গাছের ডাল চলে গিয়েছে দেখে তাই ধরে ঝুলে, প্রাচীর ডিঙিয়ে, কবির উদ্যানের মধ্যে লাফিয়ে পড়লেন।

তোমার বাড়িতে এমনিভাবে কেউ যদি হঠাৎ এসে হাজির হত তো তুমি কি ভাবতে? নিশ্চয় তুমি তাকে চোর বলে মনে করতে এবং তার অভ্যর্থনাও হত তদনুরূপ।

হাতিফি কিন্তু চোখের দেখা আর প্রথম মুহূর্তের ধারণা ধরে সিদ্ধান্ত না করে বুদ্ধিমানের কাজ করলেন। অদ্ভুত আগন্তুককে তিনি স্বাগত জানালেন। পারস্যরাজ সাগ্রহে তাঁর অভিযান-কাহিনী বর্ণনা করলেন—এই নিয়ে পরে কবি কয়েকটি নূতন কবিতা রচনা করেছিলেন।

*

* *

সাধারণতঃ পরের দুর্বলতা ধরা যেমন সহজ তেমন আর কিছুই নয়; প্রত্যেকেরই দোষ-ত্রুটি রয়েছে, সে-সব তার চেয়েও তার প্রতিবেশীরা ভালো জানে। কিন্তু যদি আমরা মানুষকে অতিরিক্ত অন্যায় রকম বিচার করতে না চাই তবে প্রত্যেকের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু যা রয়েছে সেটি খুঁজে বের করতে হবে। কথায় আছে, "তোমার বন্ধু যখন টেরা, তাকে দেখো এক পাশ দিয়ে।"

তোমার সহপাঠীদের মধ্যে যাকে মনে হয় বোকা এবং ঢিলে সে-ই হয়তো ক্লাসে সকলের চাইতে বেশি পরিশ্রমী।

যে শিক্ষকটিকে তোমাদের মনে হয় কঠোর এবং রূঢ় তিনিই তোমাদের অত্যন্ত ভালোবাসেন, তোমাদের উন্নতিই তাঁর কাম্য।

যে বন্ধুটিকে তোমার কখনো কখনো মনে হয় কি বিরক্তিকর এবং নীরস সে-ই বোধহয় সব সত্ত্বেও তোমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

কত লোককে বিচার করা হয় অসৎ বলে, যাদের সঙ্গে ব্যবহারে কোন সহানুভূতি দেখান হয় না, তাদেরও হৃদয়ের গভীরে রয়েছে যে কি জিনিস কেউ তা দেখতে জানে না।

একটা প্রকান্ড নেকড়ে বাঘ 'আগোবিও' শহরের আশেপাশের জঙ্গল এবং ক্ষেত্র সব ভীতিসঙ্কুল করে তুলেছিল। এমনই ভয় যে কেউ রাস্তায় বেরুতে পর্যন্ত সাহস পায় না। জানোয়ারটা মানুষ জন্তু নির্বিশেষে সব হত্যা করতে লাগল।

অবশেষে সাধু সেন্ট ফ্রান্সিস ঐ ভয়ঙ্কর জন্তুটার সঙ্গে সাক্ষাতে একটা বোঝাপড়া করবেন স্থির করলেন। শহর থেকে বের হলেন তিনি, সঙ্গে কিছু দূর চলল স্ত্রী পুরুষ বহুলোক। বনের কাছে এসে পৌঁছুলে হঠাৎ নেকড়েটি ভীষণ মুখ হাঁ করে সাধুর ওপর লাফিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস শান্তভাবে ইঙ্গিত-

সূচক হাত তুলতেই নেকড়ে থেমে দাঁড়াল, তারপর তার পায়ের তলায় মেষশাবকের মত লুটিয়ে পড়ল।

—"ভাই নেকড়ে বাঘ!" সেন্ট ফ্রান্সিস তাকে বললেন, "এই দেশের তুমি অনেক ক্ষতি করেছ; হত্যাকারীদের যে মৃত্যুদণ্ড ধার্য তা-ই তোমার পাওয়া উচিত; তুমি সকলের ঘৃণার পাত্র। কিন্তু তোমার এবং 'আগোবিও'-বাসী আমার বন্ধুদের মধ্যে সদ্ভাব করিয়ে দিতে পারলে আমি খুশি হতাম।"

নেকড়েটি মাথা নীচু করল এবং লেজ নাড়ল।

—"ভাই নেকড়ে বাঘ!" ফ্রান্সিস বলে চলেছেন, "আমি কথা দিচ্ছি যে তুমি যদি এঁদের সঙ্গে মিত্রভাবে থাক তাহলে এঁরাও তোমার ওপর সদয় হবেন আর রোজ খেতেও দেবেন। তুমি কি প্রতিজ্ঞা করবে যে এখন থেকে আর কোনো অনিষ্ট করবে না?"

নেকড়ে বাঘটি মাথা একেবারে নত করল এবং তার সম্মুখের ডান পায়ের থাবা সাধুর হাতের মধ্যে রাখল। তারা দুজনে এইভাবে বন্ধুত্ব করল—সরল বিশ্বাসে।



তারপর ফ্রান্সিস নেকড়েকে 'আগোবিও'র বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নিয়ে গেলেন, সেখানে নগরের জনতার সামনে তিনি আগে নেকড়ে বাঘকে যে-কথাগুলি বলেছিলেন তার পুনরুক্তি করলেন : জন্তুটি আবার পায়ের থাবা সাধুর হাতের মধ্যে রাখল—তার ভবিষ্যৎ সদ্ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি হিসাবে।

নেকড়েটি এই শহরে দু'বছর বেঁচে ছিল কিন্তু কারো কোনো ক্ষতি করেনি। প্রত্যেক দিন লোকেরা গিয়ে তাকে খাবার দিয়ে আসত। তার মৃত্যুতে সবারই দুঃখ হয়েছিল।

নেকড়েটি দেখতে যতই দুর্বৃত্ত হোক তার মধ্যে এমন কিছু জিনিস ছিল যা প্রকৃতপক্ষে সাধুটির তাকে ভাই বলে ডাকার আগে পর্যন্ত কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি। উপকথার নেকড়েটি অবশ্যই লোকের দারুণ বিরাগের পাত্র ভয়ঙ্কর একটা অপরাধের প্রতীক। তবে এ গল্পের শিক্ষা হল : যারা ধ্বংসের পথে গিয়েছে মনে হয়, কোনো আশা নেই যাদের আর, তাদেরও মধ্যে তখন পর্যন্ত রয়েছে ভালর বীজ—একটু ভালবাসা দিয়ে তা জাগিয়ে তোলা যায়।

এমন তক্তা নেই, তা যতই পচা হোক না কেন, যার থেকে কিছু ভাল সারাংশ উদ্ধার করা যায় না। সব সুদক্ষ ছুতোররা একথা জানে, কেবল অপটু কর্মীই না জেনে অবজ্ঞাভরে তক্তাটি ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু সুনিপুণ কারিগর সেটি তুলে নেবে, কীটদষ্ট অংশ কেটে বাদ দিয়ে বাকিটা সযত্নে মসৃণ করে তুলবে। গাছের সবচেয়ে শক্ত যে গাঁট তা থেকেই শিল্পী খোদাই করে তোলে সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী মূর্তি সব।

*

* *

অনেক বছর আগেকার কথা। গীয়ানা নামে বিভীষিকার দেশ। স্থানটি য়ুরোপবাসীদের পক্ষে প্রাণঘাতী। সেখানে ছিল গুরুতর অপরাধী এবং নির্বাসিতদের জন্য কতকগুলি বন্দীনিবাস। একদিন এই দেশের একজন প্রহরী-সৈন্য একদল দণ্ডিত আসামীকে কায়ান শহরে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ দুর্ঘটনাবশতঃ লোকটি বন্দরে বাড়ন্ত জোয়ারের জলে পড়ে গেল।

ভাটা পড়লে এই বন্দরটি কখনো কখনো এমনই বালিতে ভরা শুকনো থাকে যে নৌকা পর্যন্ত ভিড়ানো যায় না। জোয়ারের সময় তেমনি আবার ভীষণ তীব্র স্রোত এসে তোলপাড় করে, সমস্ত তীর ঘেঁষে থাকে যে হাঙরের দল তারাও তখন দলে দলে সেখানে এসে প্রবেশ করে।

জলে পতিত প্রহরীর ভয়ংকর অবস্থা, কারণ সাঁতার সে জানে না বললেই হয়। প্রত্যেকটি মুহূর্ত অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে তার বিপদও বেড়ে ওঠে—হিংস্র জন্তুগুলির যে কোন একটি তাকে গিলে ফেলতে পারে। অকস্মাৎ অপরাধীদের একজন তার অন্তরের ঔদার্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, প্রহরীটিকে ধরে ফেলল এবং অনেক কষ্টে তার জীবন রক্ষাও করল।

এই লোকটি ছিল একজন ঘোর অপরাধী; কয়েদীর কুর্তা গায়ে, তাতে ছাপা গ্লানিকর হরফ আর নম্বর—নামের পরিবর্তে; পথে দেখা হলেই লোকেরা অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে চলে যেত, তাকে একবার চেয়ে দেখা বা স্নেহ-পূর্ণ একটি কথা পাবারও অযোগ্য ভেবে। যথার্থ বিচার এ নয়, যেহেতু তারও ভিতরে ছিল করুণা। সমস্ত দোষ সত্ত্বেও তার হৃদয় মহৎ হতে পেরেছিল; যে দিনের পর দিন কর্তব্যের খাতিরে তার সঙ্গে নির্দয় ব্যবহার করে এসেছে তারই জন্য সে আত্মনিয়োগ করল।

*

* *

আর একটি অপরাধী কয়েদীর গল্প বলছি, তাতে দেখতে পাবে বাহ্যদৃষ্টি দিয়ে মানুষকে বিচার করলে কি রকম ঠকতে হয়।

উত্তর মারোণি দেশে এক স্বর্ণ-ব্যবসায়ী তার কাজে দু'জন খালাসপ্রাপ্ত অপরাধী নিযুক্ত করেছিল। প্রত্যেক বছর লোকটি খননকারীদের দ্বারা তোলা সোনার গুঁড়ো এবং সোনার তাল এই লোক দু'জনকে দিয়ে তিরিশ দিনের পথ নৌকা বেয়ে নিকটতম বাজারে পাঠাত।

একদিন জেলমুক্ত লোকদুটি ঠিক করল তারা পালাবে।

কারণ, অপরাধীরা তাদের শাস্তির সময় পূর্ণ হয়ে গেলেও স্বাধীনভাবে বাড়ি ফিরে যেতে পারত না, তাদের থাকতে হত কয়েদী-উপনিবেশে—অধিকাংশ ক্ষেত্রে একেবারে সারা জীবনের মত। আর যেহেত গীয়ানা দেশটা জনশূন্য অনাবাদী, ঘোর অরণ্য এবং জলাভূমিতে ভরা, মুক্তি পেলেও যেখানে সর্বদা আশঙ্কা জ্বরে অথবা অনাহারে প্রাণ হারাবার, অধিকাংশ লোকেরই সেখানে চেষ্টা সুযোগ পেলেই পালিয়ে যাবার।

তাদের জিম্মায় একটা নৌকা ছিল, সেই সুযোগ নিয়ে স্বর্ণ-ব্যাপারীর কর্মচারী দু'জন স্থির করল যে তারা নদীর অপর পারে ওলন্দাজ উপনিবেশে উঠবে গিয়ে।

তার আগে তাদের মনিবের গচ্ছিত সোনা একটা নিরাপদ স্থানে রেখে তাকে একটা চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিল কোথায় তার ধনসম্পদ রাখা আছে।

—"আপনি সর্বদা আমাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেছেন।" তাদের চিঠিতে ছিল, "বিশ্বাসভরে আপনি আমাদের কাছে যে-জিনিস গচ্ছিত রেখেছিলেন এখন পলায়নের সময় তা চুরি করে নিয়ে গেলে আমাদের পক্ষে অন্যায় হবে।"

এই দু'জন অপরাধী পূর্বে চুরির অপরাধে দণ্ডিত হয়েছিল। যেটুকু সোনা তাদের সঙ্গে ছিল তা তাদের কাছে বেশ কিছু সম্পত্তি; কিন্তু একটা জিনিস ছিল তাদের অন্তরে সৎ খাঁটি। যারা তাদের আগেকার জীবনী জানে এবং অতীত দিয়ে বিচার করে তাদের কাছে এরা অপদার্থ দুষ্কৃতজন বই আর কিছু নয়;

কিন্তু তাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পেরেছিল যে, তার কাছে এরা দু'জনে সবকিছু সত্ত্বেও সে-বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পেরেছিল।

কিশোর ছেলেমেয়েরা, আমাদের চিন্তা যেন হয় সতর্ক আর সহৃদয়তাপূর্ণ; যেন কখনো অন্য লোকের সম্পর্কে হঠাৎ সিদ্ধান্ত করে না বসি; এবং এমনকি আদৌ পরকে বিচার করা থেকে যেন বিরত থাকি, যখন তা না করে চলা সম্ভব।

শৃঙ্খলা

প্রাচীন ভারতীয়েরা পৃথিবী এবং ভূমণ্ডল সম্বন্ধে কল্পনায় একটা চমৎকার চিত্র এঁকে নিয়েছিলেন; তাঁদের সেই কল্পনা শৃঙ্খলার একটা ছক নির্দেশ করত।

মনুষ্যবাসের জায়গাটির নাম জম্বুদ্বীপ। তার চারদিক লবণ সমুদ্রে ঘেরা। তার চারদিকে মাটির বৃত্ত। তারপর একটা দুধের সাগর। তারপর আবার একটা মাটির বৃত্ত। তার চারদিকে একটা ননীর সমুদ্র। তারপর আবার মাটি, মাটির পর দধিসমুদ্র। তারপর আবার মাটি, তারপর সুরাসমুদ্র। তারপর পুনরায় মাটি এবং তারপরে চিনির সমুদ্র। তার পাশে আবার সেই মাটি, শেষে নির্মল জলের সপ্তম এবং শেষ বৃত্ত; এইটিই সুমিষ্ট, সকলের চেয়ে সুমিষ্ট সমুদ্র!

এখন আমাদের বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত একটা পৃথিবীর মানচিত্র যদি নাও তো তার মধ্যে চিনির সমুদ্র খুঁজে পাবে না, দুধের সাগরও না, অন্য কিছুই না। ভারতবর্ষের লোকেরা যে এগুলি সত্যি সত্যি আছে মনে করতেন তা নয়; এটি তাঁদের কাছে কোনো গভীর সত্য প্রকাশের একটা অভিনব উপায় মাত্র।

এই প্রাচীন উপকথাটির একটা বক্তব্য হল এই যে, পৃথিবীতে সব জিনিস সৃষ্টি হয়েছে সুশৃঙ্খলভাবে থাকার জন্য; পৃথিবী কেবল তখনই হবে একটা শান্তির স্থান, একটা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্র, একটা বাসযোগ্য ভূমি যখন সেখানে প্রত্যেকটি জিনিস তার নিজের নিজের স্থান গ্রহণ করেছে। লবণ, দুধ, চিনি, জল—এসবের যেটি সেরা হোক না, তা কি ভোগ করতে পারবে, সব যদি সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো না থাকে, কল্পনা কর যদি থাকে বিশ্রীভাবে একসঙ্গে মিশে?

*

*   *

মানুষের সকল ধর্মগ্রন্থে নানারকম রূপক আশ্রয় করে এই শৃঙ্খলার কথা বলা হয়েছে।

হিব্রু ধর্মগ্রন্থে যে বিশ্বসৃষ্টির কথা বলছে সেখানেও বর্ণিত আছে তার নিজস্ব ধরনে এই শৃঙ্খলার কথা।

প্রথমে ছিল বিশৃঙ্খলা, অর্থাৎ অনিয়ম ও অন্ধকার। ভগবানের প্রথম কাজ হল এই বিশৃঙ্খলার উপর আলোকপাত করা, ঠিক যেমন একটি লোক গভীর অপরিচ্ছন্ন গুহায় অবতরণের আগে অন্ধকারের মধ্যে তার বাতির আলো নিক্ষেপ করে।

তারপর, বাইবেল বলেছে কি করে দিনের পর দিন বিশৃঙ্খলা থেকে জিনিসগুলি নিয়মের মধ্যে এসে স্থান গ্রহণ করল; তারপর অবশেষে হল মানুষের আবির্ভাব।

শৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, সর্বত্র তাকে আবিষ্কার করা—মানুষের গৌরব এইখানে।

জ্যোতির্বিদ্ তারাপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে থাকে, আকাশের চিত্রপট এঁকে তোলে; নক্ষত্রের নিত্যকার গতি অনুধাবন করে, তাদের নাম দেয়, সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণ্যমান গ্রহগুলির গতি পরিমাপ করে, আগে থেকে দেখতে পায় চন্দ্র কখন পৃথিবী ও সৌর অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে এসে পড়বে, ফলে ঘটবে যাকে আমরা বলি গ্রহণ। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সমস্ত নির্ভর করে একটা শৃঙ্খলার জ্ঞানের উপর।

পাটিগণিতও একটা শৃঙ্খলার শাস্ত্র। এমনকি, ছোট শিশুটি পর্যন্ত সংখ্যাগুলি সুশৃঙ্খলভাবে পর পর বলে যেতে আনন্দ পায়। অচিরেই সে আবিষ্কার করে যে আঙুল অথবা কাঠি গুনে—এক, পাঁচ, তিন, দশ, দুই এরূপ বলার কোন অর্থ নেই। সে গুনে চলে : এক, দুই, তিন, চার; এই রকমে সমস্ত গণিত-বিজ্ঞান এসে পড়ে।

আর এমন সুন্দর জিনিস যে গান, নিয়ম ছাড়া তার কি অবস্থা হত? সুরের সাতটা পর্দা আছে; সা রে গা মা পা ধা নি। তুমি যদি এইগুলিকে একটার পর একটা বাজিয়ে চল তো বেশ শোনাবে, কিন্তু যদি সবকটাকে একসঙ্গে মিশিয়ে বাজাও তাহলে একটা বিকট আওয়াজের সৃষ্টি হবে মাত্র। কেবল একটি বিশেষ পারম্পর্যে তারা একসঙ্গে সুছন্দ ধ্বনি তুলতে পারে। যেমন—সা গা পা সা একসঙ্গে বাজালে, যাকে আমরা বলি নিখুঁত সঙ্গত। সমস্ত সঙ্গীত-বিজ্ঞান এই শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত।

দেখান যেতে পারে যে শৃঙ্খলা হল সকল বিজ্ঞানের—মানুষ আবিষ্কার করতে পেরেছে যত শিল্পকলা সকলের—ভিত্তি।

*

* *

আর সব ক্ষেত্রেই কি এ-জিনিসটি সমান অপরিহার্য নয়?

তুমি যদি কোনো ঘরে ঢুকে দেখতে পাও আসবাবপত্র, বই, কাগজ সব ওলটপালট ছড়ানো এবং সবার ওপর ধুলোর পুরু আস্তরণ, তাহলে বলে ওঠ, "কি বিশৃঙ্খলা, কি অপরিষ্কার!" কারণ অপরিচ্ছন্নতা বিশৃঙ্খলা বই আর কিছু নয়। পৃথিবীতে ধুলোর স্থান আছে তবে সেটা আসবাবপত্রের ওপরে নয়।

তেমনি, কালির স্থান দোয়াতে, হাতের আঙুলে বা পর্দার গায়ে নয়।

প্রত্যেকটি জিনিস যখন আপন আপন স্থানে তখন সবই পরিচ্ছন্ন। তোমার বিদ্যালয়ের বইপত্র, তোমার জামাকাপড়, তোমার বাড়ির খেলনা, প্রত্যেকের নিজস্ব একটা স্থান থাকা উচিত এবং কেউ কারো জায়গা নিয়ে যেন গোল না বাধায়। নতুবা দেখা দেবে লড়াই; তোমার বই ছিঁড়বে, জামায় দাগ পড়বে,

খেলনা হারাবে। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিজেকে না হারিয়ে, আবার সব সাজিয়ে নিতে তোমার অসীম পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতা লাগবে। অথচ জিনিসপত্র ঠিক ঠিক শৃঙ্খলামত থাকলে কত সুবিধে!

মানুষের সমস্ত জীবন, তাদের সকল কাজকর্ম, এবং এমনকি, একটা দেশের ধনসম্পদ ও উন্নতি এই শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে।

সেইজন্য কোন দেশের শাসকমণ্ডলীর প্রধান কাজই হল যথাযথ শৃঙ্খলা রক্ষা করা। সম্রাট, রাজা অথবা রাষ্ট্রপতি থেকে নিম্নতম চৌকিদারটিকে পর্যন্ত প্রত্যেককে এর জন্য যথাসাধ্য আয়াস করতে হয়। প্রত্যেক নাগরিকেরও, যাই হোক না কেন তার জীবিকা, এই শৃঙ্খলারক্ষার কাজে অংশগ্রহণ করা উচিত; একটা সমৃদ্ধ ও দীর্ঘায়ু সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা দেশে গড়ে তুলতে সকলেই সাহায্য করতে পারে।

ভেবে দেখ, সামান্য একটুখানি বিশৃঙ্খলার ফলে কখনো কখনো কি দারুণ পরিণাম ঘটতে পারে।

অগণিত রেলগাড়ি যে দেশ-বিদেশময় চলছে তারা যাতে সংঘর্ষ এড়িয়ে হিসেবমত ঠিক সময়ে আসে এবং ছেড়ে যায় তার জন্য স্টেশন-কর্মচারী, সংকেতজ্ঞাপক, পয়েন্টস্‌ম্যান প্রভৃতি সকলের কি পরিমাণ নিয়মের বশে এবং নির্ভুলভাবে চলতে হয়। যদি দৈবাৎ কি অবহেলাবশতঃ এই শৃঙ্খলা এক মুহূর্তের জন্যও ভেঙে যায় তবে কি দুর্ঘটনাই না ঘটতে পারে! সামান্য একটু দেরী কত জিনিস বিপর্যস্ত করে দিতে পারে : বন্ধুরা ঠিক সময় মত সাক্ষাৎ করতে পারে না, কর্মচারীরা তাদের আপিসে এবং ব্যবসায়ীরা তাদের কাজে উপস্থিত হতে পারে না, যাত্রীরা জাহাজ ফেল করে। আরও কত রকমের অসুবিধা ঘটতে পারে। সে-সব তোমরা কল্পনাও করতে পার না।

চিন্তা কর, পৃথিবীর সমস্ত নিয়ম ও শৃঙ্খলা যদি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় তবে কি শোচনীয় অবস্থা দেখা দেবে!

দেখ, একটা বাড়ির কাজে সব লোক বিব্রত হয়ে পড়ে যখন শুধু একটা ঘড়ি তার নিয়মের সুন্দর স্বভাব ত্যাগ করে পিছিয়ে পড়তে আরম্ভ করে অথবা পাগলের মত ছুটে এগিয়ে চলে। তখন নিখুঁত নিয়মমত চালাতে না পারলে তাকে বরং ফেলে দেওয়াই ভাল।

এক প্রাচীন গোলাবাড়ির বড় ঘরে একটা পুরানো আমলের দেওয়ালঘড়ি ছিল। একশ পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে তার নিয়মমত টিক-টিক শব্দ কখনো থামেনি। দিন আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন ভোরে গোলা-বাড়ির মালিক নেমে আসত এবং তার প্রথম কাজই ছিল গিয়ে ঘড়ি দেখা, লক্ষ্য করা, সেটা ঠিকমত চলছে কি না। একদিন সকালে রোজকার অভ্যাসমত যেমন সে ঘরে ঢুকেছে অমনি ঘড়িটা তাকে বলে উঠল :

"দেড়শ বছরেরও বেশি আমি একটানা খাটছি আর নির্ভুলভাবে ঘণ্টা নির্দেশ করে আসছি। এখন আমি ক্লান্ত, এবার যদি আমার টিক-টিক বন্ধ করে বিশ্রাম নিই তাহলে সেটা কি ন্যায়সঙ্গত হবে না?"

—"সুশীল ঘড়ি, তোমার দাবি যুক্তিযুক্ত নয়," বুদ্ধিমান মালিকটি উত্তর করল, "কারণ তুমি ভুলে যাচ্ছ যে প্রত্যেক টিক-টিকের মাঝখানে এক সেকেন্ড করে বিশ্রামের সময় নিয়েছ তুমি।"

ঘড়ি কথাটা ভেবে দেখল, তারপর আবার পূর্বের মত চলতে লাগল।

বালকবালিকাগণ, এই গল্পের অর্থ কি? তা হল এই : সুশৃঙ্খল কাজে ক্লান্তি এবং বিশ্রাম একটা সাম্য রক্ষা করে চলে, আর নিয়মানুবর্তিতা অনেক কষ্ট এবং শ্রমের ক্লেশ দূরীভূত করে দেয়।

*

* *

সুশৃঙ্খলার মধ্যে রাখলে প্রত্যেকটি জিনিসের শক্তি কত বেড়ে যায়। সর্বাপেক্ষা শক্তিমান যন্ত্র সেগুলিই নয় কি যাদের প্রত্যেকটি অংশ, প্রত্যেকটি চাকা, প্রত্যেকটি ভারদণ্ড তাদের নিজের নিজের কাজ শৃঙ্খলার সঙ্গে নির্ভুল-ভাবে সম্পন্ন করে? এমনকি, এই রকম যন্ত্রের ক্ষুদ্রতম পেরেকটি যখন তার নিজের স্থানে থাকে তখন প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে তার মর্যাদা সবচেয়ে বড় চাকাখানির সমানই বলা চলে।

সেই রকম, যে-ছেলেটি তার কাজকর্ম যত্নের সঙ্গে করে সে বিদ্যালয়ের, স্বগৃহের, বিরাট বিশ্বের মধ্যে যে-একটি নিজস্ব ক্ষুদ্র পৃথিবী অধিকার করে আছে সে-সমস্তের শৃঙ্খলারক্ষার জন্য একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ হয়ে ওঠে।

প্রথম প্রথম শৃঙ্খলারক্ষা করা কিছু শক্তই মনে হবে। কিন্তু বিনা চেষ্টায় কিছুই আয়ত্ত করা যায় না : সাঁতার কাটতে, দাঁড় টানতে, ব্যায়াম করতে শেখা কিছু সহজ নয়; তবে ক্রমে ক্রমে সব আয়ত্তে আসে। এমনকি, কিছুকাল পরে সব জিনিস আমরা অনায়াসেই শৃঙ্খলার সঙ্গে করে ফেলতে শিখি। আর ক্রমশঃ বিশৃঙ্খলা আমাদের কাছে ক্লেশকর বিরক্তিকর বলে মনে হতে থাকে।

প্রথম যখন তুমি হাঁটতে শিখেছিলে তখন কতবার ভুল পা ফেলেছ, পড়ে গিয়েছ, আঘাত খেয়েছ, কেঁদেওছ। এখন যখন তুমি হাঁট তখন মনেই ভাব না যে হাঁটছ, এবং সুকৌশলে সুন্দর ছুটতেও পার। এই দেখ, তোমার হাঁটা বা ছোটার গতি শৃঙ্খলারই একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত—শৃঙ্খলার সঙ্গে কর্মরত তোমার সব স্নায়ু, পেশী, দেহের প্রতিটি অঙ্গ।

শৃঙ্খলা এমনি করে পরিশেষে অভ্যাসে পরিণত হয়।

তাই বলে একথা কখনো আবার বিশ্বাস ক'রো না যে শৃঙ্খলানিষ্ঠ, নিয়মানু-গত, সময়নিষ্ঠ হতে হলে তোমার খুশি হওয়া বা হাসা চলবে না। নির্ভুল-ভাবে কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে যে বিষণ্ণ মুখ করে চলতে হবে এমন কোনো

অর্থ নেই। প্রমাণস্বরূপ, শৃঙ্খলার উপর আমাদের এই পাঠ একটু হাসি দিয়ে শেষ করছি।

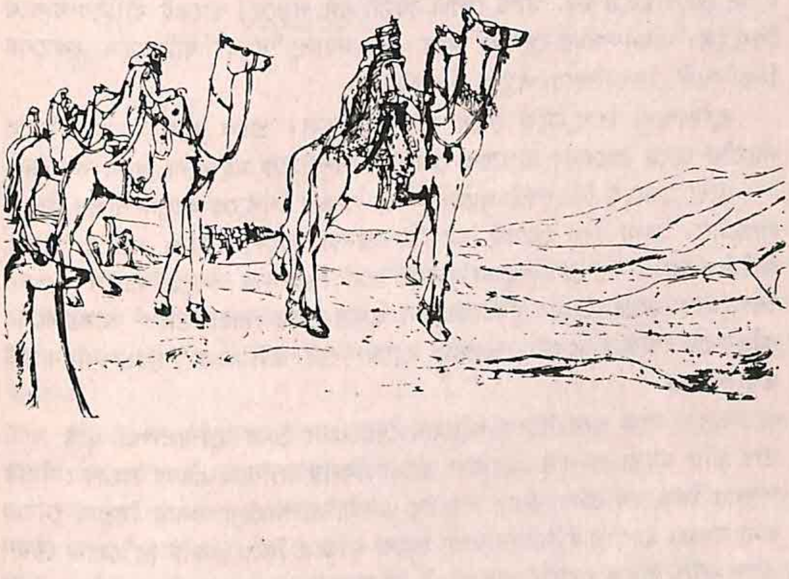
সময়নিষ্ঠার এক উদাহরণ শোন, কিন্তু এর অনুকরণ করতে যেও না যেন।

আরবদেশী কোন স্ত্রীলোকের এক ভৃত্য ছিল। ঘরে উনুনে আগুন জ্বালবার জন্য তিনি ভৃত্যটিকে প্রতিবেশীর এক বাড়ি থেকে কিছু কাঠকয়লার সন্ধানে পাঠালেন।

ভৃত্যটি পথে মিশরযাত্রী একদল লোকের দেখা পেয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল এবং স্থির করল সেও তাদের সহযাত্রী হবে। ফলে পুরো একটি বছর তার কামাই গেল।

ফিরে এসে সে প্রতিবেশীর বাড়িতে গেল কাঠকয়লার সন্ধানে। তা নিয়ে আসতে সে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, জ্বলন্ত কাঠকয়লা মাটিতে গড়িয়ে পড়ে নিভে গেল। তখন সে বলে উঠল :

—"তাড়াতাড়ি করতে যাওয়া বড় খারাপ!"



ভাঙ্গা ও গড়া

বালক-বালিকা সব, তোমরা সকলেই জানো ভাঙা আর গড়া কাকে বলে।

যোদ্ধা অস্ত্র হাতে নিয়ে যায় ধ্বংস করতে।

গৃহনির্মাতা নকশা আঁকে, ভিত্তি খনন করে; বহুলোকের কর্মঠ হাত মিলে গড়ে তোলে কৃষকের গোলাবাড়ি অথবা রাজপুত্রের প্রাসাদ।

ভাঙার চেয়ে গড়া ভাল। তবু কখনো কখনো ধ্বংস করা দরকার হয়।

তোমরা, বালক-বালিকাগণ, তোমাদের সবল বাহু আর হাত আছে তা দিয়ে তোমরা কি শুধু গড়বেই? কখনো ভাঙবে না? আর যদি ভাঙ তো কি ভাঙবে?

এই ভারতীয় উপকথাটি শোন:

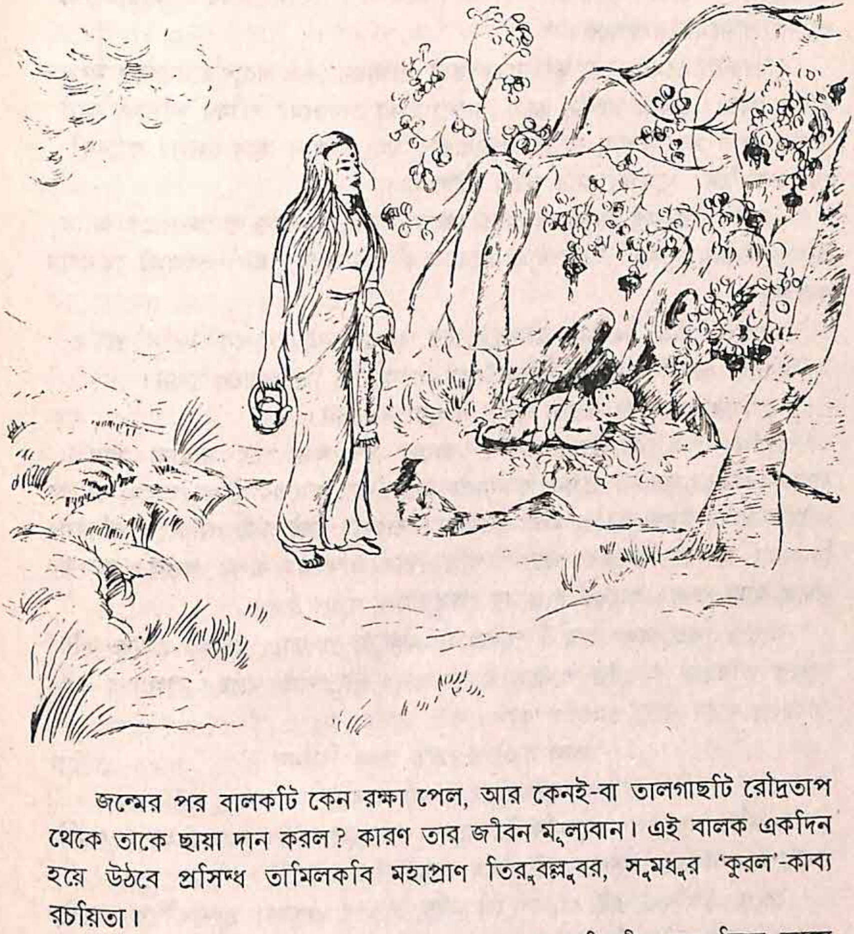
একটা গাছের তলায় একটি সদ্যোজাত শিশু পড়ে রয়েছে। তুমি ভাবতে পার এখনি সে নিশ্চয় মারা যাবে, কারণ তার মা তাকে সেখানে ফেলে রেখে চিরদিনের মত চলে গিয়েছে। কিন্তু ওই দেখ, ইলুপ্পাই গাছের চমৎকার ফুল-গুলি থেকে মধুর মত মিষ্টি ফোঁটা ফোঁটা রস পড়ছে। তাতেই বাঁচিয়ে রাখছে শিশুকে। এমন সময় সেখান দিয়ে এক দয়ালু রমণী যাচ্ছিলেন ঝোপের নিকটবর্তী শিবমন্দিরে পুজো দিতে।

দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে দেখে তার দয়া হল। তাকে তুলে নিয়ে বাড়িতে স্বামীর কাছে গেলেন। অপুত্রক লোকটি শিশুটিকে মহানন্দে গ্রহণ করলেন।

তারা উভয়েই ইলুপ্পাই গাছের নীচে পাওয়া শিশুকে লালন-পালন করতে লাগলেন। প্রথম দিন থেকেই আত্মীয়স্বজনরা তাদের বিদ্রূপ করতে লাগল, জাতিগোত্রহীন শিশুকে পালন করছে বলে তিরস্কার করতে লাগল। তখন শিশুটিকে রেখে তাদের বিরাগভাজন হবার ভয়ে তারা তাকে আস্তাবলের কড়িকাঠে ঝোলান একটা দোলনায় রেখে দিয়ে এল এক পারিয়া-পরিবারের তত্ত্বাবধানে।

কয়েক বছর পরে বালক শক্তিমান দেহ এবং প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে, যারা তার প্রতি মমতা প্রদর্শন করেছিল তাদের বিদায় জানিয়ে একলা ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ ভ্রমণ করার পর সে একটা তালগাছের তলায় বিশ্রাম নেবার জন্য বসল। ইলুপ্পাই গাছের তলা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে একটি স্ত্রীলোক যেমন তাকে বাঁচিয়েছিল তেমনি এখন এই তালগাছটা ভালবাসার অন্তর দিয়ে তার সেবা করতে লাগল। কারণ যদিও এত লম্বা কাণ্ড যে-গাছের তার পক্ষে পাতা দিয়ে সারাদিন ধরে কাউকে ছায়া দান করা অসম্ভব, তথাপি গল্পে আছে যে এই ছায়া স্থিরই ছিল—যতক্ষণ বালক ঘুমিয়ে ছিল ততক্ষণ তার স্নিগ্ধতা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল তাকে।

এখন, কেন এ-রকম ঘটনা ঘটল?



জন্মের পর বালকটি কেন রক্ষা পেল, আর কেনই-বা তালগাছটি রৌদ্রতাপ থেকে তাকে ছায়া দান করল? কারণ তার জীবন মূল্যবান। এই বালক একদিন হয়ে উঠবে প্রসিদ্ধ তামিলকবি মহাপ্রাণ তিরুবল্লুবর, সুমধুর 'কুরল'-কাব্য রচয়িতা।

তাই যে-সব জিনিস অথবা যে-সব লোকেরা পৃথিবীর জন্য নিয়ে আসে একটা বিশেষ অর্থ তাদের রক্ষা করতে হবে।

সবল বাহুর বলে যা-কিছু সুন্দর, যা ভাল, যা সত্য তাদের বর্মাবৃত রেখে, মৃত্যু এবং ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি—আনন্দের কথা এ।

এদেরই এমনিভাবে রক্ষা করতে গিয়ে সময়ে সময়ে আমাদের যুদ্ধ করতে এবং ভাঙতে হবে।

*
* *

যে তিরুবল্লুবর মানুষকে দিয়েছিলেন অনুপম বাণী তিনি যুদ্ধ

করেছিলেন এবং লোকবধও করেছিলেন। তিনি বধ করেছিলেন কাবেরীপাক্কমের রাক্ষসকে।

কাবেরীপাক্কমের এক ভূস্বামী। তার হাজারখানেক গরুবাছুর আর মস্ত গমের ক্ষেত। একটা রাক্ষস এসে আশেপাশের লোকদের ভীষণ শঙ্কিত করে তুলল—শস্য সব উপড়ে ফেলে, গরুবাছুর মানুষ খুন করে চলল। কাবেরী-পাক্কমবাসীদের দুঃখের আর সীমা রইল না।

—"যে বীর এই রাক্ষসের হাত থেকে আমাদের মুক্তি দেবে তাকে আমি একটা বাড়ি দান করব, ভূমি দান করব, অর্থ দান করব," ধনী ভূস্বামী ঘোষণা করলেন।

বহুদিন যায় কোনো বীরপুরুষের দেখা নেই। তখন তিনি পর্বত-শিখরবাসী জ্ঞানী সাধুদের কাছে গিয়ে কিংকর্তব্য জিজ্ঞাসা করলেন।

—"তিরুবল্লুবরের কাছে যান", সাধুরা বললেন।

তিনি অতঃপর তরুণ কবির কাছে উপস্থিত হয়ে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তিরুবল্লুবর তখন খানিকটা ছাই নিয়ে হাতের উপর রেখে তাতে পাঁচটা অক্ষর লিখলেন ও মন্ত্র পড়লেন। তারপর সেই ছাই আকাশে উড়িয়ে দিলেন। অক্ষরগুলি এবং মন্ত্রের শক্তি গিয়ে রাক্ষসের উপর পড়ল। রাক্ষস তাতে মারা গেল। কাবেরীপাক্কমের লোকেরাও খুশি হল।

আরও কিছুকাল পরে তিরুবল্লুবর মাদুরা গেলেন। অনেক লোক তাঁর সুন্দর কবিতার আবৃত্তি শুনতে জড়ো হল। ইলুপ্পাই গাছের বালকের এই কাব্যাংশ শুনে তারা চমৎকৃত হল :

—"ভাল হওয়ার চেয়ে ভাল জিনিস
পৃথিবীতে মেলা ভার।"

একটি নিস্তরঙ্গ পুষ্করিণীর জলে পদ্মফুল ভরা। জলের ধারে একটি বেঞ্চে মহাপণ্ডিত একসার কবি বসে আছেন।

বেঞ্চে উপবিষ্ট এই লোকগুলি নীচ জাতের একজন সহকর্মীকে একটু জায়গা দেবার জন্যে কিছুমাত্র চিন্তিত হল না। বরং তারা নানা প্রশ্নে তাকে বিভ্রান্ত এবং কোনো প্রকারে ভুল বলিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। শেষে তারা তাকে বলল :

—"ওহে পারিয়া, তোমার কবিতা এই বেঞ্চের উপর রাখ। এটি যদি সত্যকারের সুন্দর সৃষ্টি হয় তো এই বেঞ্চ শুধুমাত্র ওই কুরলকেই ধারণ করবে।"

তিরুবল্লুবর তাদের পাশে তাঁর রচনা রাখলেন। গল্পে কথিত আছে যে সেই মুহূর্তেই বেঞ্চিটি ঠিক মাত্র বইটি ধারণের পরিসরে সঙ্কুচিত হয়ে গেল। অহঙ্কারী এবং হিংসুটে মাদুরার কবিরা পুকুরের জলে ডিগবাজি খেয়ে

পড়ল। সত্যিই ঊনপঞ্চাশজন ঈর্ষান্বিত লোক পুকুরে পদ্মের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। তারা সকলে সেখান থেকে সিক্তবস্ত্রে লজ্জায় উঠে এল। সেই থেকে তামিল ভাষাভাষীরা সকলে কুরলকে অত্যন্ত গভীরভাবে ভালোবাসে।

*

* *

ছেলেমেয়েরা, কাবেরীপাক্কমের রাক্ষস মরেছে বলে কি তোমাদের রাগ হয়? মাদুরার ঊনপঞ্চাশজন দুরাচার কবি জলে পড়ে গিয়েছিল বলে কি তোমাদের অনুশোচনা হয়?

এই পৃথিবীতে ভাল এবং মন্দ দুই জিনিস আছে। আমরা চাইব ভাল জিনিস, তাদের রক্ষা করব; সব মন্দ জিনিসের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের হীনবল করে ফেলব।

মহাকবি তিরুবল্লুবরের মত জ্ঞানী ব্যক্তি সকলেই কিরূপে এই কাজটি করতে হয় তা জানেন। যাঁর যত বেশি জ্ঞান তিনি তত ভালরূপে এটি করতে পারেন। কিন্তু অত জ্ঞানী এবং অত ভক্তিমান না হয়েও ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের অনুকরণ করতে এবং ফলতঃ বীরত্ব দেখাতে পারে।

এমনিভাবে তিরুবল্লুবরের বোন আবৈ তার ভাইকে অনুকরণ করেছিল।

একদিন উরেইয়ুরের ছোট একটা রাস্তায় মাটির উপর বসে ছিল সে। এমন সময় তিনজন লোক এল: প্রথমজন রাজা, অপর দু'জন কবি।

রাজা নিকটবর্তী হতেই আবৈ রাজাকে সম্মান দেখানর জন্য এক পা গুটিয়ে বসল।

প্রথম কবি এলে পরে তার প্রতি সৌজন্য দেখানর জন্য আবৈ আর এক পা গুটিয়ে বসল।

কিন্তু দ্বিতীয় কবি আসতেই সে উল্টো কাজ করল—হঠাৎ তার দুটি পা-ই ছড়িয়ে দিয়ে পথরোধ করে বসল।

এইরূপ কাজ ঔদ্ধত্যজনক। কিন্তু আবৈ জেনেশুনেই ওরূপ করেছিল; দ্বিতীয় কবি ছিল ভণ্ড, বলত অনেক তার বিদ্যেবুদ্ধি। প্রকৃতপক্ষে সে-সব কিছুই তার ছিল না।

সে বিরক্তভাবে আবৈকে তার এরকম আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তর হল:

—"আমাকে এমন এক পদ কবিতা লিখে দিন যার মধ্যে 'মন' শব্দটি তিনবার থাকবে।"

লোকজন জমা হয়েছে দেখে কবি তার পাণ্ডিত্য দেখাতে চাইল। কিন্তু পঙ্‌ক্তির পদটির মধ্যে উপরোক্ত কথা দু'বারের বেশি বসাতে পারল না।

—"আপনার কাছে যে অবশিষ্ট মনটুকু আছে, যা আপনার কবিতায় কোথাও স্থান পেল না, তার কি করলেন?" বিদ্রূপ করে বলল আবৈ। এইরূপে অহঙ্কারী লোকটিকে সে লজ্জা দিয়েছিল।

তোমরা কি ভাবছ যে অভদ্র হতে তার খুব আনন্দ হচ্ছিল? একটুও না। তবে কপটতাও তার কাছে শ্রদ্ধেয় জিনিস বলে মনে হয়নি। কোন্ জিনিসের সম্মান পাওয়া উচিত আর কোন্ জিনিস তার অনুপযুক্ত, এ পার্থক্যবোধ তার ছিল।

—"মহাত্মা সব," সে বলত, "হাঁস যেমন যে-সরোবরে পদ্ম ফুটে আছে সেখানে যায় তেমনি আপনাদেরও যা ভাল তার দিকে যাওয়া উচিত। দুষ্ট-লোকদের যা-কিছু খারাপ তারই দিকে লক্ষ্য, যেমন দুর্গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে শকুন তার বীভৎস খাদ্যের দিকে ছুটে চলে।"

*

*   *

সকল দেশের বীর ছেলেমেয়েরা, তাহলে কোন্ খারাপ জিনিসগুলির বিরুদ্ধে তোমাদের সংগ্রাম করতে হবে? কোন্ জিনিসগুলি মানুষকে দমন অথবা ধ্বংস করতে হবে?

সে-সবই যা তার জীবন বিপন্ন করে, উন্নতির ক্ষতি করে; সব যা তাকে দুর্বল করে, সব যা তাকে নীচে নামায়, সব যা তাকে অসুখী করে।

দুর্বার স্রোতের উপর সেতু নির্মাণ করে নদীকে জয় করতে হবে, তীর বরাবর বাঁধ দিয়ে বন্যার জল রোধ করতে হবে।

ঝড় এবং ঢেউয়ের আক্রোশের সম্মুখীন হবার জন্য সুদৃঢ় জাহাজ তৈরি করতে হবে।

খাল কেটে বদ্ধ জলাভূমি থেকে প্রাণঘাতী জল বের করে দিয়ে তাকে শুকিয়ে ফেলতে হবে, তার যে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে জ্বরের অসুর তাকে বধ করতে হবে।

বন্য জন্তুরা যেখানেই মানুষের জীবন বিপন্ন করে তোলে সেখানে, সর্বত্র তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে।

অনেক সুচিকিৎসক তৈরি করতে হবে—তারা সকল স্থান থেকে দুঃখ এবং রোগ বিদূরিত করবে।

চেষ্টা করতে হবে অনশনের মূল দারিদ্র্যকে পরাভূত করতে, যে দারিদ্র্যের জন্য কত মাতা তাদের ছেলেদের মুখে অন্ন দিতে না পেরে অশ্রুপাত করছে।

নির্মূল করতে হবে যত অন্যায়, ঈর্ষা, অবিচার—মানুষের জীবনকে যা করে তুলেছে দুর্বিষহ।

*

*   *

আবার কোন্ সব জিনিস মানুষ আকাঙ্ক্ষা করবে এবং রক্ষা করবে? সে-সমস্তকিছুই যা তাকে বাঁচতে সাহায্য করে, তাকে মহত্তর, অধিকতর শক্তিমান, অধিকতর আনন্দপূর্ণ করে তোলে।

পৃথিবীতে আসে যে প্রত্যেক শিশু তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে—তাদের জীবন মূল্যবান।

রক্ষা করতে হবে যে-সব গাছ আমাদের বন্ধু; আহার্য এবং আনন্দ পাওয়ার জন্য উৎপন্ন করতে হবে তরুলতা এবং ফুল-ফল।

নির্মাণ করতে হবে সুগঠিত, স্বাস্থ্যকর এবং প্রশস্ত বাসস্থান।

সযত্নে রক্ষা করতে হবে পবিত্র সব মন্দির, প্রস্তরমূর্তি, চিত্রশিল্প, নানা রকমের সূচীকর্ম,—সেই সঙ্গে উৎকৃষ্ট গান, উৎকৃষ্ট কাব্য ও আর যে সমস্ত জিনিস তাদের সৌন্দর্যে আনন্দবর্ধন করে।

কিন্তু, ভারতের ও অন্যান্য দেশের ছেলেমেয়েরা, সর্বাগ্রে মানুষকে লক্ষ্য রাখতে হবে হৃদয়ের দিকে—যা দিয়ে ভালবাসা যায়, বুদ্ধির দিকে—যা দিয়ে করা যায় ঋজু চিন্তা, হাতের দিকে—যা সম্পন্ন করে মহৎ কর্ম।

পরিশিষ্ট

এই গল্পগুলি "ছোটদের গল্প"-এর পূর্বতন সংস্করণগুলিতে প্রকাশিত হয়নি।

দাতা

রন্তীদেব ছিলেন রাজা, হলেন বনবাসী সন্ন্যাসী। তিনি ধনরত্ন গরীবদের বিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং অরণ্যের নির্জনতায় যাপন করেছিলেন সরল জীবন। তাঁর শুধু সেইটুকুই ছিল যা দিয়ে পরিবারসহ নিজের জীবনের প্রয়োজনটুকু মিটে যায়।

একদিন আটচল্লিশ ঘণ্টা উপবাসের পর ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সামান্য পরমান্নের ব্যবস্থা হয়েছিল।

এক গরীব ব্রাহ্মণ তখন তাঁর কুটীরের দুয়ারে এসে অন্ন প্রার্থনা করল। রন্তীদেব তাঁর পরমান্নের অর্ধেক ভাগ তাঁকে দিলেন। তারপর জনৈক শূদ্র এসে সাহায্য চাইল, অবশিষ্টের অর্ধেক রন্তীদেব তাকে দিলেন।

এমন সময় শোনা গেল একটি কুকুরের চিৎকার; বেচারা পশু মনে হল ক্ষুধার্ত। রন্তীদেব বাকিটা তাকে দিয়ে দিলেন। শেষে সন্ন্যাসীর দরজায় এসে ভিক্ষা চেয়ে দাঁড়াল এক পারিয়া অচ্ছুত। রন্তীদেব তাকে একটু দুধ আর চিনি দিয়ে আবার উপবাসে থাকলেন।

তারপর চারজন দেবতা এসে তাঁকে বললেন :

—"তুমি যে অন্ন দিয়েছ তা আমাদেরকেই; আমরাই সেই ব্রাহ্মণ, শূদ্র, কুকুর ও গরীব অচ্ছুত-এর রূপ ধরেছিলাম। সকলের প্রতিই তুমি সদয় হয়েছিলে, প্রেমার্দ্র ভাবের জন্য আমরা তোমার গুণগান করছি।"

এই রকমে সদয় হৃদয় যাঁর তিনি সকল লোক এবং পশুকে পর্যন্ত একটি পরিবারের, এক অখণ্ড মানবজাতির, একজন বলে বিবেচনা করেন।

*

* *

রোজ কি এমন লোকেদের সঙ্গে দেখা হয় না যারা আমাদের চেয়ে কম জানে? বিভিন্ন বিষয়, এই যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, ব্যায়াম, কাজকর্ম, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি নিয়ে তাদের কাছে উপকারী হতে পারে এমন কিছু বলা—তা তো আমাদের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে।

ক্ষুধার্তকে অন্ন দেওয়া যেমন আমাদের কর্তব্যের অঙ্গ তেমনি আমাদের জ্ঞানের ভাগ দেওয়াও কর্তব্যের অঙ্গ।

অজ্ঞ লোক নিজের অনিষ্ট করে : সে তার প্রতিবেশীর অনিষ্ট করে, যেমন অপটু বাঁশীবাদক এক ব্রাহ্মণকে যন্ত্রণা দিয়েছিল। শোননি কী করে তা ঘটেছিল?

একদা এক ব্রাহ্মণ যখন গ্রামাঞ্চলের পথে চলছিল তখন একটি ফুলের ভিতর থেকে নিঃসৃত গলা শুনে অবাক হল। বার কয়েক সেই গলা তাকে

উদ্দেশ্য করে বলল, আদেশ দিল পুকুরে গা না ধুতে, সন্ধ্যা-আহ্নিক না করতে, না খেতে, তাকে ফেলে দূরে না যেতে।

তখন সে চেঁচিয়ে উঠল :

—"কে তুমি, যা আমার কাছে একটুও ক্ষতিকর না তা করতে বারণ করছ?" (যাতে মন্দ কিছু নেই)

লাইলাক ফুলের ভিতর থেকে কণ্ঠ উত্তর দিল :

—"আমি একজন ব্রহ্মরাক্ষস। পূর্বজন্মে ছিলাম ব্রাহ্মণ এবং সংগীতশাস্ত্রে এক মহাপণ্ডিত, কিন্তু অপরকে সেই জ্ঞানের ভাগ দেবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না। আমার জ্ঞান আমার জন্যই রেখেছিলাম। এখন শাপগ্রস্ত ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে আছি এবং রোজ আমাকে একজন লোকের বাঁশী শুনতে হয়; আর বলতে পারি না কত বীভৎস তার বাজনা। মারাত্মক ব্যাপার। কতবার চেয়েছি গাছ ছেড়ে যেতে, বাজনাটা কেড়ে নিয়ে ওর সদ্ব্যবহার দেখাতে, তার আঙুলগুলি যথাস্থানে বসিয়ে দিতে, কি করে নিঃশ্বাস নিতে হয় বোঝাতে। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়; আমাকেও তাই বাধ্য হয়ে শুনতে হয় তার বেসুর..."

গল্পের বাকিটা তোমাদের এখানে বলতে পারছি না; শুধু বলে রাখি, সুখের বিষয় যে তার যন্ত্রণামুক্তির একটা উপায় পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু দেখতে পাচ্ছ কুকর্ম, কু-শিল্প কিংবা আশেপাশের লোকদের কু-সংগীত আমাদের কেমন পীড়া দেয়।

*

* *

যে ক্ষুধার্ত, কোন্ একটি মাত্র জিনিস তাকে তৃপ্ত করবে? খাদ্য। যে তৃষ্ণার্ত, কোন্ জিনিস তাকে তৃপ্ত করবে? জল। কেউ যদি অজ্ঞ, কোন্ একটি মাত্র জিনিস তাকে সাহায্য করবে? জ্ঞান।

ক্ষুধার্তকে অন্ন, তৃষ্ণার্তকে জল, অজ্ঞকে জ্ঞান দেওয়া ভালো।

পাণ্ডুর পাঁচটি পুত্র, মহান পঞ্চ পাণ্ডব, এক প্রাসাদে ছিলেন যা বাইরে থেকে দেখতে সুন্দর ও আরামদায়ক। কিন্তু ওটি শত্রুর তৈরী; পুরোচনের নির্দেশে তার মেঝে, দেয়াল, ছাদ এমন জিনিসে গড়া যে একটুতেই আগুন লেগে যায়; আর তার মতলব ছিল এক রাত্তিরে যখন পাণ্ডবরা ঘুমন্ত তখন তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া; যে পাঁচজন রাজপুত্রকে সে হিংসা করত তাদের সরিয়ে দেবার এই পন্থা।

এমন ছিল তার ছলনা। এই দুষ্ট উদ্দেশ্যে সে লাগিয়েছিল গঠনকর্মে তার চতুরতা এবং ষড়যন্ত্রে তার সূক্ষ্মতাকে।

একদিন এই প্রাসাদে এল এক খনক। সে চুপি চুপি রাজপুত্রদের বলল :

—"তোমাদের এক বন্ধু আমাকে এখানে পাঠিয়েছে, তোমাদের সাহায্য করতে। আমি খনির কর্মী। বলো, কোন্ রকমে তোমাদের উপকারে আসতে

পারি। নিশ্চিত সূত্রে জানি যে, তোমাদের শত্রু, পুরোচন স্বয়ং, এই গৃহে তোমাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে চেষ্টা করবে।”

তখন জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব খনককে বললেন :

—“মাটির তলা দিয়ে পথ কাটার তোমার যে দক্ষতা তা লাগিয়ে, প্রিয় সজ্জন, আমাদের জন্য সুড়ঙ্গ একটা কেটে দাও যাতে দুয়ারে প্রহরী থাকলেও আমরা পালাতে পারি; কারণ তোমার খনিত্রে খোদাই এবং তোমার বুদ্ধির দ্বারা ব্যবহার্য করে তোলা এই গোপন পথের সাহায্যে আমরা জীবন বাঁচাতে পারব।”

ভূগর্ভে, প্রাসাদের একেবারে মাঝখানে খনক খুঁড়তে শুরু করল। পাণ্ডবরা তক্তা নিয়ে তৈরি ছিল গর্ত ঢেকে ফেলতে এবং তক্তাগুলির ওপর গালিচা টেনে দিতে যদি পুরোচন এসেই পড়ে। এরকমে দেওয়া হয়েছিল শঠে শাঠ্যং।

শেষে পাঁচজন রাজকুমারের কাছে খবর গেল যে সুড়ঙ্গ তৈরী। তা গিয়ে উঠেছিল বনের মধ্যে এক অতি সুন্দর জায়গায়।

এক রাত্তিরে রাজপুত্ররা ওই প্রাসাদে আগুন লাগিয়ে দিল, এবং ওই পাতালপথের দৌলতে তাদের মা কুন্তীসহ আপন জীবন রক্ষা করল। রাস্তা অন্ধকার ছিল কিন্তু নির্ভুল। মহাবীর ভীম যখন দেখলেন সঙ্গীরা যথেষ্ট তাড়াতাড়ি পালাতে পারছে না তখন তিনি মাকে তুলে নিলেন কাঁধে, দু'ভাইকে কাঁকে, আর অন্য দু'ভাইকে দুই বাহুতে; এরকম বোঝা নিয়ে দুর্নিবার ঝড়ের মতো ছুটলেন তিনি, এলেন প্রাণান্তক আগুন থেকে দূরে।

পুরোচনের চক্রান্ত ভণ্ডুল হয়েছিল একজন সহৃদয় খনকের পটুতায়। খনির লোকটি শুধু নিজের জন্য গুপ্তধন আবিষ্কারের আশায় মাটি খুঁড়তে প্রয়াসী হয়নি; সে কোদাল চালিয়েছিল পরের জন্য। নিজের জ্ঞান দিয়ে সে অপরদের সাহায্য করেছিল, তার বিজ্ঞান সে বিতরণ করে দিয়েছিল।

*

* *

পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতম দেশও সব জেনে ফেলতে পারেনি। আমাদের পরস্পরকে শেখাতে হবে, মানুষ থেকে মানুষকে, দেশ থেকে দেশকে, বিশ্বের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে,—আর প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক মানুষের, সে নিজে যা জানে তা অপরকে শেখাতে সুখী বোধ করা উচিত।

প্রাচ্যের কাছে প্রতীচ্যের লোকেরা এনেছে তাদের বৈজ্ঞানিক, যান্ত্রিক, আর্থিক ইত্যাদি জ্ঞান...

প্রতীচ্যকে দিয়েছে প্রাচ্য বরাবর তার দার্শনিক ও নৈতিক জ্ঞান।

ভারতবর্ষ অপর সব দেশকে দিয়েছে সেই জ্ঞান যা নিহিত বেদে, বুদ্ধের সত্যপথের নির্দেশ-বাণীতে, আর অন্য সকল পবিত্র গ্রন্থে।

একটি শিশুও জ্ঞান দিতে পারে। একটি শিশু অপরকে বর্ণ পরিচয় করাতে পারে। একটি শিশু অন্যকে সহজ হিসাব শেখাতে পারে, কিংবা চেনাতে

পারে উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম, আর না হয় একটা গিট বাঁধা, একটি বীজ পুঁততে শেখাতে ইত্যাদি...

আমরা সবাই দাতা হতে পারি। একটি পুণ্য শাস্ত্রে বলেছে : "পাওয়ার চেয়ে দেওয়ার মধ্যে অনেক বেশি আশীর্বাদ।"

"জ্ঞান বিজয়"

মহাঋষি ভৃগু আপন ঐশ্বর্যে জ্যোতিষ্মান, তিনি গিরি কৈলাসের চূড়ায় আসীন আর ভরদ্বাজ তাঁকে প্রশ্ন করছিলেন :

পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?
আকাশ কত বিশাল?
কে তৈরি করল জল আগুন বাতাস মাটি?
জীবন কী?
ভালো কী?
পৃথিবীর ওপারে কী আছে?

আর এরকম আরো নানা প্রশ্ন। প্রশ্নগুলি বিরাট এবং যে ঋষি সবের উত্তর দেবেন তিনিও নিশ্চয় বিরাট!

কিন্তু ভরদ্বাজের মন মানুষের মন, যা প্রশ্ন করে, নিরন্তর ও আরো জানতে চায়, যার জানতে চাওয়ার শেষ নেই।

প্রশ্ন করতে শিশুর তুলনা নেই। সর্বদা তার জিজ্ঞাসা—কী এটা? কী ওটা? কী করে এটা হল? কী এ জিনিসটাকে নড়ায়? বিদ্যুৎ কে জ্বালে? জোয়ার-ভাঁটা কেন? কোথা থেকে আসে সোনা আর কয়লা? আর লোহা? কী করে বই ছাপা হয়?...এরকম আরো অনেক প্রশ্ন।

শিশু এবং বড়রা জিজ্ঞাসা করে। তারা উত্তরও দেয়। আমরা যখন কিছু জিনিস জানি তখন উত্তর দিতে পারি। আমরা অপরকে শেখাতে, জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে পারি।

কী শিখব আমরা? কী শেখাব? যুগ যুগ বেয়ে যা এসেছে তা-ই শিখতে চেষ্টা করব? মানুষের জিহ্বা যত শব্দ উচ্চারণ করতে পারে সে সব শিখতে সচেষ্ট হব আমরা?

মহাভারত কাব্যে পাণ্ডব ও অন্যান্য যোদ্ধাদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত তীরের নানা রকমারি ধরন বোঝাতে নিম্নলিখিত নামগুলি ব্যবহৃত হয়েছে : শর, বাণ, ইষু, শায়ক, পত্রী, কান্ত, বিষিপ্ন, নারাচ, বিজাত, পৃষত, ভল্ল, তোমর, শল্য, ইষীকা, শিলীমুখ, অঙ্গুলিকা। তীরের এই সব নাম শেখার অবশ্য আমাদের প্রয়োজন নেই। কত জিনিসের আরো কত নাম আছে যা শেখবার দরকার নেই।

আমরা নানারকম খবরের কথা বলি : চিন্তায় আসে জাহাজডুবি, খুন-খারাপি, চুরি, বিবাদ, মামলা, যুদ্ধ, অগ্নিকাণ্ড, বাদ্যিবাজনা, বিয়ে, কবর এবং হাজার রকম জিনিস কয়েক মিনিটে পড়া এবং পরমুহূর্তে ভুলে যাওয়া যেতে পারে।

*

* *

আমরা কোরাণ খুলি এবং এই পবিত্র গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের শিরোনামায় পড়ি এই শব্দ : "সমাচার" আর সঙ্গে সঙ্গে মনে ভাবি জাহাজডুবি, খুন-খারাপি...কিন্তু দাঁড়াও!

পয়গম্বর মহম্মদ হাল্কা মনের মানুষ ছিলেন না যে কুকীর্তির সংবাদে মজা পাবেন কিংবা এমন বাচালও নন যে মহৎ কিছুই শেখান না। 'সমাচার' অধ্যায়ের আরম্ভটা পড়া যাক :

কোমল-হৃদয় দয়ালু আল্লার নামে।
তারা সব মিলে কী আলোচনা করে?
মহৎ সংবাদ।
এই বিষয়ে বিতর্ক করে তারা?
না, তবে তারা জানতে চায়।
অবশ্য জানবে তারা!

"মাটিকে আমরা খাটের মত করিনি?
পাহাড়দের তাঁবুর খোঁটার মতো?
তোমরা কি সৃষ্ট হওনি জোড়ায় জোড়ায়?
তোমাদের ঘুম পাড়াইনি যাতে বিশ্রাম পাও?
রাত্রি করিনি জোব্বার মতো?
দিন রুটি রোজগারের জন্য?
তোমাদের মাথার ওপরে বানাইনি সপ্ত আকাশ?
আর রাখিনি সেখানে একটি দীপ যে জ্বলে?
ঘনীভূত মেঘ থেকে বারি বর্ষণের ব্যবস্থা করিনি,
যাতে তৃণ শস্য সর্বত্র গজিয়ে গজিয়ে ওঠে
আর যত বাগান গাছে গাছে ছেয়ে যায়?"

এমনি করে পয়গম্বর মানুষের হৃদয়ে ও মনে আশার আলো জেবলে দিয়েছিলেন মহৎ জিনিস ভাবতে শিখিয়ে, এমন সব জিনিস যার সৌন্দর্য স্থায়ী, এমন জিনিস যা মানুষকে বুঝিয়ে দেয় জীবনের জগৎ কত মহিমময়।

তাহলে স্বীকার করব এমন কথা এমন জিনিস এবং এমন সংবাদ আছে শোনার বা পুনরাবৃত্তির যোগ্য নয়। অন্যদিকে আবার এমন জিনিস যা শ্রবণ ও পুনরুচ্চারণের উপযুক্ত, যদিও তাদের আবিষ্কারের জন্য অনেক কষ্ট অনেক সময় ও শ্রমের মাসুল দিতে হয়।

*

* *

মানুষের শক্তি তার চিন্তায়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এত কুশল দুই হাত, তার সেই চিন্তার দাস যে সিদ্ধান্ত করে ও চালায়।

যেদিন থেকে মানুষ পৃথিবীর উপর বসবাস নির্বাচন করেছে সেদিন থেকে প্রকৃতির ওপরও কত-না তার মহৎ বিজয়। তার শক্তির এক পরিচয় দেখি রামের সমুদ্র পার হওয়ার চিত্রে।

যখন তিনি ভারতবর্ষের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছালেন এবং জানলেন যে তাঁর প্রিয় পত্নী লঙ্কাদ্বীপে বন্দী তখন জলধি অতিক্রমের উদ্যোগ শুরু করলেন। তাঁর সেনাবাহিনী অসংখ্য, তবে তা তৈরি বাঁদর আর ভালুক দিয়ে। সেই বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ কী করে তিনি পার হবেন।

রামের বুদ্ধি গভীর, তাঁর জ্ঞান মর্মভেদী, তাঁর হৃদয় বীরত্বে পূর্ণ।

প্রথমে তিনি বুড়ো সমুদ্রকে মৃদুগলায় ডাকলেন এবং বললেন :

—"মহাসমুদ্র, তোমায় মিনতি করি, আমার সেনাদলকে যেতে দাও।" কিন্তু সেই থেকে তিন দিন অপেক্ষা করার পরও তরঙ্গমালার উত্তর পেলেন না।

রাম তখন তাঁর ভাইকে ডাকলেন :

—"লক্ষ্মণ! আমার তীর ধনুক নিয়ে এস। এই সাগরের সঙ্গে বৃথাই কথা বলেছি, ঠিক যেমন একজন লোক বালিতে সুন্দর বীজ পুঁতে সেসব হারায়।"

বীর দেবতা রাম সেই গভীর জলে তীর নিক্ষেপ করলেন, সমুদ্রে তার যাত্রাপথে জাগল এক জ্বলন্ত বেদনা, মাছেরা দারুণ ভয় পেয়ে গেল। সমুদ্র-দেবতা তখন এক ব্রাহ্মণের রূপ ধরে সোনার থালায় মণিমুক্তার অর্ঘ্য ভরে প্রণত হলেন দেবচূড়ামণির সামনে।

সমুদ্র রামের কমলোপম চরণ আলিঙ্গন করে বলল :

—"দেবোত্তম, আমার পাপ মার্জনা করুন। আমি আমার আত্মীয় বায়ু পৃথিবী অগ্নির মতোই। তারা ভারী, মন্থর এবং ক্ষমতায় এত অভ্যস্ত যে আপনার মতো দেবতার ডাকে সাড়া দেয় না। আপনার আগে আর কোনো বীর আমাকে তার ইচ্ছার অনুগত করাতে পারেনি। আপনার ভিতরে আমি দেখছি আমার প্রভুকে। আপনার যা ভাল মনে হয় করুন।"

দেবোত্তম রাম হাসলেন :

—"বলো আমাকে," বললেন তিনি, "কী করে আমার সেনাবাহিনী তোমার ঊর্মিমালা ও ঝঞ্ঝার রাজ্যের উপর দিয়ে পার হবে।"

—"আমার জলে আমার উদর বহন করবে পাথরের রাশি," সমুদ্র বলল, "সেগুলি তোমার সেনাদল ছুঁড়ে ফেলতে পারে যাতে ওরকমে ভারতবর্ষ ও লঙ্কার মধ্যে একটা সেতু গড়ে ওঠে।"

রাম তাঁর সেনাদলের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন :

—"সেতু তৈরি হয়ে যাক," বললেন তিনি।

—"জয় হোক রামচন্দ্রের," সেনাদল সমস্বরে ধ্বনি করে উঠল।

তারা উপড়ে ফেলল গাছ পাথর, খাড়ির মাথায় বড় বড় চাঙাড় পর্যন্ত, নিয়ে এল সেসব সুদক্ষ স্থপতি নল ও নীলের কাছে; নল ও নীল কাঠ-পাথর

এমনভাবে জড়িয়ে বাঁধল যে অটুট হয়ে তারা সমুদ্রের বুকে ভাসতে লাগল। রামের সেনাবাহিনী তার উপর দিয়ে পার হয়ে গেল।

রাম ভারতবর্ষের এক পাহাড়ের চূড়ায় বসে দেখছিলেন তাঁর অগণিত সেনাদল সেতুর উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

রাম যেরকম সমুদ্রের অন্তরকে তাঁর বাধ্য করেছিলেন তেমনি মানুষের চিন্তা—যা মানুষের গৌরব—সাগর জয় করেছে। এবং সমুদ্রের সঙ্গে আরো অনেক কিছু। মানুষ বায়ুকে অধীনে রাখে যাতে সে নৌকার পাল ফাঁপিয়ে তোলে, আর কলের পাখা ঘোরায়। সে জয় করেছে বরফ ও তুষার, কারণ অভিযাত্রীরা গিয়েছে উত্তর মেরুর আর দক্ষিণ মেরুর বরফাচ্ছন্ন দেশে, পার হয়েছে উচ্চতম পাহাড়। সে জয় করেছে পশুদের, যেহেতু পৃথিবীর সর্বত্র যে-সব জন্তু-জানোয়ার তার নিজের ও পরিবারস্থ অন্যদের পক্ষে বিপজ্জনক তাদের মেরেছে—সিংহ, বাঘ, নেকড়ে, সাপ এমনকি হাঙর পর্যন্ত যদিও বিশাল সমুদ্রে তার ক্ষমতা ন্যূনতর, পৃথিবীর ওপর তার দাপট সে বুঝিয়ে দিয়েছে; আর যেমন সে তার পক্ষে ক্ষতিকর পশুদের বিনাশ করেছে তেমনি তার উপকারীদের আবার রক্ষণ পালন করেছে—ষাঁড়, ঘোড়া, ভেড়া, হাতি ইত্যাদি...

কিন্তু এ সবই বাহুবলের দ্বারা, যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা জয়লাভ; আর বাহু, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র হল চিন্তার দাস।

মানুষ জয়লাভ করে জ্ঞানের দ্বারা। আবার জ্ঞানকেও সে জয় করে: সে প্রশ্ন তোলে, আরো আরো জিজ্ঞাসা করে, থামতে চায় না যতক্ষণ না সে সত্যিকারের জেনেছে।

ইতিহাসে বর্ণিত কিছু লোককে বলা হয় দিগ্বিজয়ী: যেমন মহাবীর আলেকজান্ডার, যিনি পশ্চিম এশিয়া ও মিশর জয় করেছিলেন; জুলিয়াস সিজার, যিনি ফরাসীদেশ ও ইংলন্ড জয় করেছিলেন; সম্রাট বাবর, যিনি উত্তর-ভারত করতলগত করেছিলেন; নেপোলিয়ন, যিনি কিছুকালের জন্য ইউরোপের অধীশ্বর হয়েছিলেন।

কিন্তু বিজয়ী হবার অন্য পন্থাও আছে।

তুমিও বিজয়ী হতে পার। পৃথিবীতে এমন জিনিস আছে যা জানা ও শেখা দরকার। জিজ্ঞাসা করো, খোঁজো, শেখো, বিজয়লাভ করো। তখন নিজেকে বলতে পারবে: দিগ্বিজয়ী।

নম্রতা

এই জাপানী বাড়িতে ঢুকতেই দোরগোড়ায় কে চোখে পড়ে? ফুলের শিল্পী; যে মানুষটি ফুল সাজাতে নিপুণ।

গৃহকর্তা থালা হাতে করে নিয়ে আসেন যার ওপর ফুল, কাঁচি, ছুরি, ছোট্ট একটি করাত আর সুন্দর একটি ফুলদানি।

"মহাশয়", শিল্পী বলেন, "এমন সুন্দর ফুলদানির যোগ্য সুন্দর তোড়া আমি সাজাতে পারি না।"

—"আমি জানি আপনি নিশ্চয় পারবেন," গৃহস্বামী ঘর থেকে বের হয়ে যেতে যেতে বিনয়ভরে বললেন।

নিজে একলা বসে শিল্পী কাজ শুরু করেন,—কেটে, ছেঁটে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, বেঁধে, যতক্ষণ না নয়নরঞ্জন একটি সুন্দর তোড়া ফুলদানিতে রাখা হয়।

গৃহস্বামী ও তাঁর বন্ধুরা ঘরে ঢুকলেন; শিল্পী সরে দাঁড়ালেন ও মৃদু-স্বরে বললেন: আমার তোড়া অতি সামান্য, দয়া করে তা-ই গ্রহণ করুন।

—"না," গৃহস্বামী উত্তর দেন, "এ তো খাসা!"

টেবিলের পাশে তোড়ার কাছে শিল্পী রেখেছেন কাঁচি। তিনি যেন বলতে চান তোড়ায় আছে কোনো ত্রুটি, কেউ তুলে নিতে পারেন কাঁচি এবং যা দৃষ্টি-কটু তা কেটেছেঁটে দিতে পারেন।

শিল্পী কাজ করেছেন সুন্দর কিন্তু তার কদর নিজে করতে বসেননি। দোষত্রুটি থাকতে পারে স্বীকার করলেন তিনি। তিনি নম্র।

হতে পারে জাপানী শিল্পী সত্যিই ভাবেন তাঁর কাজের প্রশংসা পাওয়া উচিত। তাঁর মনের কথা বলতে পারব না। তবে আর যাই হোক তিনি তো হামবড়াই করেন না, আর তাঁর ব্যবহারও নরম।

অন্য দিকে, যারা আত্মম্ভরী তাদের দেখে হাসব।

এমনি হলেন দামাস্কাসের খলিফা—সুলেমান। এক বৃহস্পতিবার গরম-স্নান থেকে উঠে তিনি পরলেন সবুজ পোশাক মাথায় বাঁধলেন সবুজ পাগড়ি, বসলেন সবুজ এক সোফায়, চারদিকের পর্দাও সব ছিল সবুজ। তারপর আয়নায় মুখ দেখে নিজে সন্তুষ্ট বোধ করে বললেন: "নবী মহম্মদ ছিলেন পয়গম্বর: আবু বকর সত্যের বিশ্বস্ত সেবক: ওমর সত্য ও মিথ্যার তফাত জানতেন; ওতমান ছিলেন বিনয়ী, আলি সাহসী, মুয়াইগা দয়ালু, ইয়াজিদ ধৈর্যশীল, আবদুল মালিক একজন সুশাসক, ওয়ালিদ তেজস্বী মানব, কিন্তু আমি হলাম তরুণ ও সুদর্শন।"

ফুলগুলি পাত্রে খুব সুন্দর সাজানো হয়েছে তাতে আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু সেজন্য বাহাদুরি দেবার দায় আমাদের, শিল্পীর নয়।

সুলেমান সুদর্শন, তিনি যে তা জানেন তাতেও কোন দোষ নেই। কিন্তু আমাদের হাসি পায় যখন দেখি আয়নায় তিনি স্বরূপে মশগুল এবং বলেন তাঁর সুরূপ সত্যবান ওমর কিংবা ধৈর্যশীল ইয়াজিদের চেয়েও তাঁকে বেশি সুন্দর করেছে।

*

* *

আরো অলীক হল সেই মানুষটির অহংকার যিনি ভাবেন তাঁর মহিমার তুলনায় পৃথিবী নিতান্ত ছোট, যাঁর উচিত আরো উঁচু আকাশে উড়ে যাওয়া।

গল্পটা এই রকম।

পারস্যরাজ কাই খাঁ অনেক যুদ্ধ করেছেন এবং অনেক যুদ্ধে জিতেছেন। শত্রুর ধনরত্ন কবলিত করে তিনি এত ধনী হলেন যে আলবের্জ পাহাড়ে দুটি প্রাসাদ গড়লেন; ঘরে ঘরে সোনা-রূপার এত প্রাচুর্য যে সেই মসৃণ ধাতুর চকমকিতে দিনের আলোই ফুটে উঠত।

কাই খাঁ দুর্বিনীত অহংকারে টইটম্বুর: নিজেকে ভাবতে লাগলেন পৃথিবীর সেরা রাজা।

দুষ্টবুদ্ধি ইবলিস দেখল রাজার নিজের সম্বন্ধে তুঙ্গ ধারণা আর মনে মনে মতলব আঁটল তাঁকে ঠকাতে। সে প্রাসাদে চাকরের ছদ্মবেশে এক দৈত্য পাঠাল, যে রাজাকে দেবার জন্য হাতে নিয়ে চলেছে একটি ফুলের তোড়া।

চাকরটি কাই খাঁর সামনে আভূমি নত হয়ে বলল:

—"খোদাবন্দ্, পৃথিবীতে আপনার তুল্য রাজা আর নেই। কিন্তু একটি রাজ্য জয় করা আপনার এখনো বাকি আছে, উচ্চতর জগৎ, যা হল সূর্য, চন্দ্র, গ্রহরাজি ও আকাশের সব গোপন প্রান্ত দিয়ে গড়া। হে বাদশা, পাখিদের অনুসরণ করুন, উড়ে যান আকাশে।"

—"কিন্তু পাখা ছাড়া উড়ব কী করে?" জিজ্ঞাসা করলেন রাজা।

—"আপনার পণ্ডিতরা তা বলে দেবেন, শাহানশাহ্।"

তখন রাজা কাই খাঁ জ্যোতিষীদের জিজ্ঞাসা করলেন কী করে তিনি উড়ে যেতে পারবেন নভোলোকে এবং তাঁরাও আবিষ্কার করলেন এক অভিনব পন্থা। তাঁরা বললেন সাধারণ উপায়ের কথা কিন্তু রাজার তা পছন্দ হল না।

বাসা থেকে ধরে আনলেন চারটি ঈগল পাখির ছানা, তাদের খাইয়ে-দাইয়ে তালিম দিয়ে শক্ত-সবল বড় করে তুললেন।

বানালেন কাঠের একটি সমচতুর্বাহু পাটাতন, তার প্রত্যেক কোণে আঁটা দাঁড়, প্রত্যেক দাঁড়ে এক খণ্ড ছাগ মাংস। প্রত্যেক কোণে আবার বাঁধা থাকল একটি ঈগল।

রাজার সিংহাসন সেই পাটাতনের উপর বসান হল: সিংহাসনের পাশে থাকল এক পাত্র মদিরা। রাজা বসলেন।

চারটি ঈগল মাংসখণ্ড ধরতে গেল এবং সেজন্যে সোজা উপরে ওড়াতে তুলে নিয়ে চলল সেই সঙ্গে পাটাতনটিও জনতার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে। ঈগলরা উপরে উঠতে লাগল, আরো উঠতে লাগল, ক্রমে প্রায় চাঁদের কাছে পর্যন্ত, যতক্ষণ না ওড়ার ক্লান্তিতে থেমে গেল বাতাসের গায়ে তাদের ডানার আঘাত। তারপর সেই পাটাতন, সিংহাসন, রাজা, সুরার পাত্র, যাবতীয় কিছু এক দারুণ শব্দ করে পড়ল চীনদেশের এক নিরালা কোণে। রাজা পড়ে রইলেন চিৎপাত হয়ে, নিঃসঙ্গ, মুমূর্ষু, ক্ষুধার্ত, বেচারা; যতক্ষণ না এল অনুচররা এবং তাঁকে নিয়ে গেল প্রাসাদে।

রাজা তখন বুঝলেন কত মূঢ় এবং অহংকারী হয়েছিলেন তিনি। প্রতিজ্ঞা করলেন নিজের সাধ্যের ওপরে উড়তে আর কখনো চেষ্টা করবেন না। রাজ্যের কাজকর্মে মন দিলেন এবং এত ন্যায়নিষ্ঠতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করলেন যে সকলে ধন্য ধন্য করল।

এই রকমে আত্মম্ভরিতার উঁচু আকাশ থেকে নেমেছিলেন সুন্দর সুদৃঢ় মাটির নম্রতায়।

*

*　*

শুধু যারা আত্মাদর দেখায় তাদেরই নয়, যারা হামবড়াই করে তাদের প্রতিও আমরা সময়ে সময়ে অবজ্ঞা দেখাই। নিজের ঢাক পেটায় যারা তাদের কেউ ভালবাসে না; একজন এমন আত্মপ্রচারককে আর একজন আত্মপ্রচারক পর্যন্ত তাচ্ছিল্য করে।

জেনে অবাক হই না যে রামের দারুণ শত্রু, যে হরণ করেছিল তাঁর স্ত্রী সীতাকে, সে ছিল মদগর্বী; এমন রাক্ষসের পক্ষে তা হওয়া তো স্বাভাবিকই।

রাম এবং লংকার রাক্ষসদের মধ্যে শেষ মহাযুদ্ধে মহিমান্বিত প্রভু তাঁর রথে রাক্ষসরাজের মুখোমুখি এলেন—সে-ও নিজের রথে আসীন। সে যুদ্ধের তুলনা নেই। রাক্ষসচমূ এবং কপিভল্লুকের সেনাবাহিনী সেই সংগ্রাম চাক্ষুষ করল।

তখন লংকাধিপতির নির্মম কণ্ঠে ঘোষিত হল :

—"হে রাম, আজ এই যুদ্ধের শেষ, যদি না রণক্ষেত্র থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে পালাও, দুর্ভাগা, আজ তোমাকে যমালয়ে পাঠাব। এ রাবণ, যার সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছ।"

রাম শান্তভাবে হাসলেন। তিনি জানতেন রাবণের চরম দণ্ড আসন্ন, বললেন :

—"হে রাবণ, তোমার বীরত্বের ব্যাখ্যান সব শুনেছি, কিন্তু এবার যেমন শুনেছি তেমনটি দেখতে চাই। দয়া করে মনে রেখ, এই জগতে তিন রকমের

মানুষ আছে, যেমন আছে তিন রকমের গাছ—যথা ঢাক, গাব, কাঁঠাল। ঢাক ফুল গাছ, শুধু ফুল দেয়। তারা বাক্‌সর্বস্ব মানুষের মতো। গাবের ফুল হয়, ফলও হয়। তারা তেমন মানুষের মতো যারা কথা বলে এবং কাজও করে। কাঁঠাল শুধুই ফল বহন করে। তারা কথা বলে না কিন্তু কাজ করে যায়।"

এই জ্ঞানগর্ভ বাণী শুনে রাক্ষস অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। কিন্তু অচিরে সেই আত্মম্ভরী কণ্ঠ চিরতরে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

*

* *

তোমরা গল্প শুনেছ মহান সলোমনের যিনি ইজরায়েলের রাজা ছিলেন, বহু বছর আগে। বাইবেল এবং অন্যান্য গ্রন্থে অনেক গল্প আছে যাতে তাঁর কীর্তি তাঁর মহিমা বর্ণিত। তাঁর সম্বন্ধে আমি একটি গল্প বলছি।

তিনি ছিলেন প্রচণ্ড ধনী। তাঁর এক অপরূপ সিংহাসন ছিল: ছিল একটা সোনার থালা: আর রূপা ছিল তাঁর প্রাসাদে ছড়ানো-ফেলানো, জেরুসালেম শহরের পাথরকুচির মতো। সওদাগরেরা নিত্য তাঁর কাছে নিয়ে আসত সোনা, রূপা, গজদন্ত, ময়ূর, বাঁদর, সুন্দর বেশবাস, রকমারি বর্ম, মসলাপাতি, অশ্ব, অশ্বতর এবং আরো নানা ধনদৌলত। পিতৃপুরুষের ও জাতির দেবতার সম্মানার্থে রাজা সলোমনই এক অপরূপ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু মন্দির নির্মাণের আগে, পাহাড়ের উপরে কাঠকাঠামো যখন সিডার গাছ-সমারোহের রূপে মাথা তুলেছিল তখন সলোমন এক স্বপ্নে দেখলেন ভগবান এসে তাঁকে বলছেন:

—"তোমাকে দিতে পারি তেমন বর চাও।"

সলোমন উত্তর দিলেন:

—"আমার ভাই দাভিদ ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ মানুষ: এখন তাঁর উত্তরাধিকারী হয়ে সিংহাসনে বসেছি আমি। সম্মুখে কাজ রয়েছে বিরাট। নিজেকে মনে হচ্ছে শিশু। আমি প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের পন্থা জানি না। যাদের রাজা তাদের কী করে শাসন করতে হয় তাও জানি না। অতএব আমার বাসনা জ্ঞানলাভের, যাতে শুভ আর অশুভ তফাত করতে পারি।"

ভগবান বললেন:

—"যেহেতু তুমি দীর্ঘায়ু অথবা ধনসম্পদ চাওনি, কিন্তু চেয়েছ জ্ঞান, এবং এমন হৃদয় যা ন্যায় অন্যায় আলাদা করতে জানে, আমি তোমাকে দিলাম এই বিজ্ঞ মন, এমনই মন যার প্রাজ্ঞতা কেউ ছাড়িয়ে যাবে না।"

লক্ষ্য করবে রাজার উচ্চারিত নম্র বাণী: "আমি একান্ত শিশুমাত্র।"

সলোমন নিজের সম্বন্ধে বিনয়-ভাষণ করেছিলেন বলে কি তাঁকে কম শ্রদ্ধা করি?

বরং ঠিক উল্টো, মহত্ব নম্রবিনত হয়েছে দেখে একটা সত্যিকারের আনন্দ পাই।

*

* *

পয়গম্বর মহম্মদের বিনয়সূচক তিনটি গল্প বলব তোমাদের।

জনশ্রুতি আছে যে ইসলামের এই নবী সর্বদা গাধার পিঠে চড়ে যেতেন, ধনী অহংকারী লোকেদের যেমন সর্বদাই পছন্দ ঘোড়া। কখনো কখনো নিজের পিছনে দু'পাশে পা ঝুলিয়ে কাউকে বসিয়ে নিতেন এবং বলতেন :

—"চাকরদের মত বসে খাই আমি, কারণ সত্যিই তো আমি চাকর।"

এবার দ্বিতীয় গল্প। একদিন পয়গম্বর উপস্থিত হলেন এক সভায় যেখানে বহু লোক জমায়েত হয়েছিল; বসবার যথেষ্ট জায়গা ছিল না। তাই হাঁটু ভাঁজ করেই বসে পড়লেন তিনি।

মরুদেশের এক আরব ছিল সেখানে। মহম্মদ এক মহান জননেতা জানা ছিল তার, তাই অবাক হল সে যে পয়গম্বর রাজার মতো সিংহাসনে বসে নেই।

—"এটা কি বসবার ভদ্র রীতি?" ঠাট্টা করল সে।

—"প্রকৃতপক্ষে," মহম্মদ বললেন, "আল্লা আমাকে দীনহীন সেবক বানিয়েছেন এবং উদ্ধত রাজা তো নয়।"

এবার তৃতীয় কাহিনী : কুরেশের উপজাতীয় সর্দারের সঙ্গে আলাপে দারুণ ব্যস্ত ছিলেন মহম্মদ, এমন সময় আবদুল্লা নামে একজন অন্ধ, পয়গম্বরের সঙ্গে কেউ আছে না জেনে, তাঁদের আলাপে হঠাৎ রূঢ় বাধা দিল—কোরানের কয়েক ছত্র শোনাবার আর্জি নিয়ে।

মহম্মদ তাকে কঠিনভাবে উত্তর দিয়ে চুপ থাকতে বললেন। কিন্তু পরে তাঁর কষ্ট হল এত কঠোর হবার জন্য এবং অতি বিনীতভাবে ক্ষমা চাইলেন। তারপর থেকে আবদুল্লাকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন, এবং নানা উচ্চপদে বসিয়েছিলেন।

*

* *

রাজা ও পয়গম্বরের গল্পকাহিনীর পরে আইজাক নিউটন নামে একজন বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিকের সম্বন্ধে একটি গল্প বলব।

নিউটনের জন্ম ১৬৪২ এবং মৃত্যু ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে। দীর্ঘ জীবন ভরে প্রকৃতির পাঠ নিয়েছিলেন : মাধ্যাকর্ষণ বলে পরিচিত বিশ্বব্যাপী আকর্ষণ-শক্তি, জোয়ার-ভাঁটার উপর চন্দ্রসূর্যের প্রভাব, সূর্যালোক এবং তার শুভ্র রশ্মি রামধনুর সপ্তবর্ণে চূর্ণিত হয়ে পড়া; এবং আরো অনেক বিষয়। এই যে লোকটি প্রকৃতির নানা ক্রিয়াপদ্ধতি ও বিস্ময়ের এত সুন্দর অনুধাবন করেছিলেন তাতে তাঁর জ্ঞানের সম্মুখে সকলেই অবাক। একদা এক মহিলা নিউ-

টনকে বলেছিলেন তাঁর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের কথা; তিনি উত্তর দিলেন :

—"হায়! বিরাট সত্য-সমুদ্রের তীরে বসে শিশুর মতো আমি নুড়ি কুড়িয়ে চলেছি।"

বুঝতে পারবে সত্যের সমুদ্র হল প্রকৃতির সেই সব নিয়ম যা মহা মহা পণ্ডিতরাও প্রায় জানেনই না। একটি শিশু সাগরবেলায় নুড়ি কুড়ায়! আর আমাদের একফোঁটা চিন্তার পাশে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কত কত বিশাল!

নিউটন শিশুর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেছিলেন বলে তাঁকে কি কম শ্রদ্ধা করি? নিশ্চয় না। তাঁর বিনয়ের জন্য তাঁকে শ্রদ্ধাই করি।

*

*   *

বহু বছর আগে জনৈকা দিগ্বিজয়ী গায়িকা, যিনি নিখুঁত প্রতিভা ও কণ্ঠস্বরের জন্য বিশ্ববিখ্যাত, এক সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সুরেলা গলা একটি বাচ্চা মেয়েকে সেখানে গাইতে বলা হল। যে গানটুকু তাকে গাইবার জন্য শেখান হয়েছিল সেটি দ্বৈতকণ্ঠের, দুজনের মিলিত গলার গান। বাচ্চাটির গলাই প্রধান; কিন্তু আর কেউ তার সঙ্গে গলা দিতে চাইল না। সকলেই মনে করল একটি অপোগণ্ডের সঙ্গে ধুয়া ধরা একান্ত মানহানিকর ব্যাপার। সব নিস্তব্ধ; কেউ এগিয়ে এল না বাচ্চাটির সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে।

তখন প্রসিদ্ধ গায়িকাটি বললেন :

—"তোমার আপত্তি না থাকলে আমি সঙ্গে গাইব।"

তিনি তাই করলেন। প্রেক্ষাগৃহে রণিত হল সেই দ্বৈতগান; কচি মেয়েটির গলা ফুটে উঠল চড়ায় সুস্পষ্ট, আর সে যুগের সবচেয়ে বেশি পরিচিতার কণ্ঠ তার ধুয়া ধরে চলল খাদে।

মহিলার নম্র হৃদয় মহৎ দেখাল একটি বালিকার সেবায় তাঁর অবদানের সম্মতিতে।

*

*   *

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে একজন ব্যাকরণ-শিক্ষকের প্রয়োজন হল এবং এই পদের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নির্বাচিত করা হল। এযাবৎ তিনি মাসে পঞ্চাশ টাকা পাচ্ছিলেন, এবার নতুন পদে তাঁর প্রাপ্য নব্বই টাকা। কিন্তু তিনি স্থির করলেন তাঁর চেয়ে তর্কবাচস্পতি বেশি যোগ্য ব্যাকরণ-শিক্ষক এবং তা জানিয়ে দিলেন। এভাবে স্থির হল তাঁর বন্ধুই তাঁর স্থানে নিযুক্ত হবেন। বিদ্যাসাগর পরম তৃপ্ত হলেন। কলকাতা থেকে বেশ কিছু দূরে গিয়ে বন্ধুকে খুঁজে বের করলেন এবং তাঁকে খবরটি দিলেন।

তর্কবাচস্পতি পণ্ডিতের মহান নম্রতায় অভিভূত হয়ে বলে উঠলেন : "বিদ্যাসাগর, তুমি মানুষ নও, তুমি নররূপী দেবতা!"

এবার একটি অহংকারী জোনাকির গল্প।

একটি লোক উজ্জ্বল সূর্যের দিকে মাথা ফেরাল এবং বলল :

—“কী জ্যোতির্ময়!”

—“ঠিক যেমন আমরা সবাই আলোময়,” উত্তর দিল একটি কণ্ঠ।

লোকটি চারিদিকে তাকাল, এবং একটি ঝোপের তলায় অন্ধকারে দেখতে পেল একটি জোনাকি।

—“তুমিই বলছিলে না কি?”

—“হ্যাঁ,” উত্তর দিল জোনাকি। “বললাম যে সূর্য ও আমি, আমরা দুজনেই উজ্জ্বল।”

—“সূর্য ও তুমি, বটেই তো!” রসিকতা করল লোকটি।

—“হ্যাঁ, সূর্য, চন্দ্র, তারার দল এবং আমি,” বেশ নাছোড়বান্দাভাবে আত্ম-তৃপ্তির সঙ্গে বলে দিল জোনাকি।

*

* *

চারটি লোক ইতালীর এক পাহাড়ে উঠছিলেন। ওই চারজন সন্ন্যাসী। তাঁদের পুরোভাগে সেন্ট ফ্রান্সিস, তিনি সম্প্রদায়ের অপর তিন ভাইকে সঙ্গে নিয়ে চলছিলেন। পাহাড়ের সর্বাঙ্গ গাছে ঢাকা, চূড়ায় একটা উন্মুক্ত সমভূমি—সেন্ট ফ্রান্সিস সেখানে গিয়ে প্রার্থনা করতে চেয়েছিলেন এই অভিলাষে যে ওখানে ভাগবত বিষয়ে এক নবদৃষ্টি পাবেন। সন্তটি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, যেমন ধনী মালিকরা তেমনি গ্রামের গরীবরা তাঁকে শ্রদ্ধা করত।

দিনটি তাপজর্জর এবং রাস্তা খাড়া। ফ্রান্সিস ক্লান্তিতে চলংশক্তিহীন। ফলে তাদের মধ্যে একজন সন্ন্যাসী একটি গ্রামবাসীকে খুঁজে বের করে তার গাধাটা চাইল, যাতে সেটিতে চড়ে ফ্রান্সিস যেতে পারেন।

গ্রামবাসীটি স্বেচ্ছায় সম্মত হল, সন্ত গাধায় চাপলেন আর সন্ন্যাসীরা দুপাশে হেঁটে চলল, সকলের পেছনে থাকল চাষীটি।

—“বলুন তো,” চাষীটি জিজ্ঞাসা করল, “আপনি কি ভাই ফ্রান্সিস?”

—“যথার্থ,” তিনি উত্তর দিলেন।

—“তাহলে,” জুড়ে দিল চাষী, “লোকে যেমন আপনাকে ভালো ভাবে তেমনটি হতেই চেষ্টা করবেন, যাতে আপনার উপর তাদের বিশ্বাস অটুট থাকে।”

সে কথা শুনে সেন্ট ফ্রান্সিস কোন বিরক্তি দেখালেন না, কারণ তিনি যে-কোনো লোকের উপদেশ নিতেন, হোক সে রাজপুত্র কিংবা দরিদ্র চাষী। তিনি গাধার পিঠ থেকে নামলেন, অভিবাদন জানালেন চাষীকে এবং তাকে সুপরামর্শের জন্য ধন্যবাদ দিলেন।

পরিবার

জনৈক মরক্কো-যাত্রী দেখলেন যে সন্ধ্যাবেলা যখন সারাদিন বিচ্ছেদের পর মেষপাল আর মেষশাবকের দল মিলিত হয় তখন বাহাদুর পশুদের মধ্যে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি শুরু হয়ে যায়, যেন কিসের সন্ধানে। আসলে প্রত্যেক মা-মেষ তার শাবককে খোঁজে ; প্রত্যেক শাবক তার মাকে খোঁজে।

এক বানরীর কটি ছানা ছিল এবং তাদের সে ভালবাসত। কিন্তু তার ভালবাসা যেন ঝরনার মতো যার পানীয় শুধু নিজের জন্যেই নয়, বরং ছড়িয়ে পড়ে সকলের জন্য। এই বানরীর সঙ্গে ছিল অন্য বানরদের ছানাও, তাদের প্রতিও সে ছিল সহৃদয়। তা ছাড়াও, সে সঙ্গে নিয়েছিল বিড়ালছানা আর কুকুরছানাও, তারা যেন পোষ্য। যখন খাবার ভাগ করে দিত তখন সে নিজের ছানা আর পোষ্যদের সমান ভাগ দিত।

মা-পাখি ডিমে তা দেয়—সেটিকে গরম রাখতে, পুরুষ-পাখি তার ও ছানাদের জন্য খাবার সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে।

আফ্রিকার গরিলা তার পরিবার ও বংশধরদের নিয়ে একটা রীতিমতো পারিবারিক জীবনই যাপন করে। শিম্পাঞ্জীরাও তাই করে। কর্তাটি গাছে সাদামাটা একটা বাসা বানায় মা ও বাচ্চাদের আশ্রয়ের জন্য, আর সারারাত জেগে পাহারা দেয় শিকার-সন্ধানী চিতাবাঘের হাত থেকে তার সংসার রক্ষার জন্য।

আমাদের পশু-ভাইবোনেরা যদি তাদের কচিদের প্রতি স্নেহ দেখাতে ও তাদের রক্ষা করতে পারে, তাহলে আদিম মানুষরাও স্বামী, স্ত্রী এবং পুত্রকন্যা নিয়ে দল কিংবা সংসার বাঁধলে আশ্চর্যের কিছু নেই।

মা কখন থেকে সন্তানকে ভালবাসতে শুরু করে? তার জীবনের শুরু থেকে।

কখন থেকে সন্তান তার মাকে ভালবাসতে শুরু করে? ঠিক একই সময়ে নয়। তাকে প্রথমে অনুভব করতে হয়, শিখতে হয় চিন্তা করতে, কর্ম করতে। তারপর সে তার মাকে ভালবাসতে শেখে এবং তার বাবাকেও।

সতেরো মাসের একটি ছোট্ট মেয়ের গল্পে আছে সে কয়েকদিন অনুপস্থিতির পরে ফিরে আসা তার বাপের সান্নিধ্যে ছুটে গিয়েছিল, তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে তার সব খেলনা দিয়ে দিয়েছিল।

মানুষ সর্বদা খুশি হয়ে উপহার গ্রহণ করে। মুসলমানদের ইতিহাসে আমরা পড়েছি যে খলিফা মামুন তাঁর বিবিকে একটি সোনার গালিচা দান করে তার উপর ঢেলে দিয়েছিলেন রাশীকৃত মুক্তা ; এবং হারেমের পরিচারিকারা প্রত্যেকে একটি করে মুক্তা নেবার পরেও সেখানে থাকল এই দামী মণিমুক্তার ঝলমলে স্তূপ।

আর, মা তার সন্তানকে কী দেন? তিনি তাকে দেন : একটি নিরেট

স্বাস্থ্য, নিটোল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; কথা বলার ক্ষমতা, সততাকে ভালোবাসার সামর্থ্য।

কারণ মা যদি সন্তানকে অবহেলা করে তবে তার স্বাস্থ্যহানি ঘটবে, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকৃত হবে, তার জিহ্বায় ফুটবে না মধুর ভাষা: সে ভদ্র ব্যবহার ও ভালোভাবে চিন্তা করতেও শিখবে না। আর এসব দান কি সোনার গালিচা এবং অঢেল মুক্তার চেয়েও বেশি মূল্যবান নয়?

যে-মা এসব সুন্দর উপহার সন্তানকে দেন তিনি অনুভব করেন তাঁর ছেলে কিংবা মেয়ের মধ্যেই রয়েছে নিজের জীবন; এবং সন্তান ভালো থাকলেই তাঁর হৃদয় যেমন আনন্দে পূর্ণ, তেমনি সে অসুস্থ হলে কিংবা মারা গেলে তাঁর অন্তর আবার দুঃখে ভরা। এক তামিল ছড়ায় শোনো মায়ের গলা:

আমার হৃদয়ে ছিল তার জীবন, কোথায় গেল সে?
হায় বাছা আমার, বাছা আমার!
কে নিয়েছে আমার সোনার পুতলি?
হায় বাছা আমার, বাছা আমার!
মধুর স্বরে সে আমাকে ডাকত 'আম্মা',
হায় বাছা আমার, বাছা আমার!
তেমন সুন্দর মুখ আর কখনো দেখিনি,
হায় বাছা আমার, বাছা আমার!
আমার কোলে হেলেদুলে খেলত সে,
হায় বাছা আমার, বাছা আমার!
ওর বাবা কি আনন্দে তুলে ধরতেন ওকে,
হায় বাছা আমার, বাছা আমার!
ওর কপালে আঁকা ছিল সৌভাগ্যের রেখাবলি,
হায় বাছা আমার, বাছা আমার!
আহা, যে কুনজরে দেখেছে তাকে তার যেন ক্ষতি হয়,
হায় বাছা আমার, বাছা আমার!
থাক বাছা আমার, না হয় আমাকেও যেতে দাও তোমার সঙ্গে,
হায় বাছা আমার, বাছা আমার!
ফিরে এসো, ফিরে এসো, একলা রেখো না আমাকে,
হায় বাছা আমার, বাছা আমার!

সদয় পিতার হৃদয়ও তেমনি সন্তানের জীবনে জীবন্ত এবং সন্তানের মৃত্যুতে তা দুঃখার্ত।

শিশুপুত্র ইব্রাহিমকে হারিয়ে কি কষ্ট পেয়েছিলেন মহম্মদ। প্রাচীন গ্রন্থে রয়েছে, শিশুটির মৃত্যু হয়েছিল পনের বা ষোলো মাস বয়সে।

কিন্তু আর একটি প্রসিদ্ধ নাটক হল 'হাসান-হুসেন' যেখানে ইব্রাহিমের

বয়স আরও বেশি বলে মনে হয়। এই নাটকে মৃত্যুদূত আজরাইল মহম্মদের গৃহে এসে পুত্রকে দাবি করল।

—"আমার অনুরোধ," গভীর হতাশভরে বললেন মহম্মদ, "আগামী কাল পর্যন্ত ওকে আমার সঙ্গে থাকতে দিন।"

মৃত্যুদূত দাঁড়ালেন একটু। ঠিক সেই সময়ে পাঠশালায় কণ্ঠ শোনা গেল বালকটির, পড়ছে কোরাণ থেকে এটি:

"দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে আশ্রয়ের মতো আল্লার কাছে উড়ে যাই আমি। পরম দয়ালু আল্লার নামে, হে তুমি, যে-আত্মা বিশ্রামরত, ফিরে যাও তোমার ঈশ্বরের কাছে তৃপ্ত হয়ে ও তৃপ্তিবিধান করে, প্রবেশ কর আমার সেবকদের মধ্যে এবং আমার বেহেস্তে আনন্দ ভোগ কর।"

পুত্রের কণ্ঠ মহম্মদের কানে কতই-না মধুর!

যে ছেলেমেয়েরা তাদের পাঠ আবৃত্তি করে তাদের কণ্ঠ বাপমায়ের কাছে কতই-না মধুর। আমি নাটকটির 'ইব্রাহিমের মৃত্যু'-অংশটির কথা বলব না। শুধু বলতে চাই তার মা মারী প্রেমভরে দৃষ্টি রেখেছে, কত স্নেহভরে তার বোন ফতিমা ইব্রাহিমের সঙ্গে কথা বলছে, কেমন করে পয়গম্বরের নাতি হুসেন নিজের জানুর উপর রাখল শিশুটির মাথা, এবং যখন ইব্রাহিম আর নেই তখন কেমনধারা অশ্রুবিসর্জন করলেন তার পিতা।

*

* *

বাপমায়েরা শুধু কি প্রখর ও বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েদেরই ভালোবাসেন? না, তাঁদের বাহু সবাইকেই সমানভাবে ঘিরে থাকে।

একদিন আমি এক গ্রামের কোন একটি কুটীরে ঢুকেছিলাম। কর্তাটি একজন মুচি, তিনি পুরনো জুতোয় তলপাটি লাগাচ্ছিলেন। গিন্নী রান্নাঘর ঝাঁট দিচ্ছিলেন। তাঁরা তাঁদের পুত্রের সম্বন্ধে আমাকে জানাবার জন্য কাজ বন্ধ করলেন। বেচারা ছেলেটি, সে প্রায় বোবা। তার কথা আমি বুঝতেই পারছিলাম না; কিন্তু তার বাপ-মা সেই অব্যক্ত চিৎকারের অর্থ বোঝেন। তার বুদ্ধি এত কম যে নিজে নিজে সে জামাকাপড় পরতে বা খেতেও পারে না। বাপ-মা সারাদিন তার উপর নজর রাখেন যাতে সে নিজের বা অন্য ছোটদের অনিষ্ট করতে না পারে। এরকম তাঁরা সাত-আট বছর ধরে করে এসেছেন; এত বিড়ম্বনা সত্ত্বেও তাকে ওঁরা ভালবাসেন।

রামায়ণে কবি গেয়েছেন সকল সন্তানের প্রতি পিতৃস্নেহ: "জনৈক পিতার গুটিকয়েক সন্তান ছিল, সকলেই চরিত্র ও স্বভাবে পৃথক। একজন বিদ্যার্থী, একজন উপবাস-ব্রতী আচার্য, একজন বৈদ্য, কেউ-বা যোদ্ধা, আবার কেউ সুদক্ষ কর্মী কিংবা ভিক্ষু। পিতাটি সকলের জন্য সমান স্নেহ দেখান। আর

একজন হয়তো বিদ্যার্জনে অপটু কিন্তু কায়-মন-বাক্যে পিতার অনুগত; পিতাটি একেই আপন আত্মার মতো ভালবাসেন।”

স্নেহময়ী মা'র দৃষ্টি অন্যদের দৃষ্টির চেয়ে গভীরে দেখতে পায়। তিনি তাঁর সন্তানের গুণ ও প্রতিভা প্রায়শ ধরতে পারেন, যেখানে অন্যরা কিছুই দেখতে পায় না।

সেই রকম রামের জননী কৌশল্যা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখেছিলেন তাঁর পুত্রের মাহাত্ম্য। একদা সে তাঁর দৃষ্টিতে রূপান্তরিত মূর্তিতে দেখা দিল। এক মুহূর্ত আগে সে ছিল শিশু মাত্র; এখন অকস্মাৎ তার প্রতি রোমকূপে দশ হাজার নক্ষত্র প্রদীপ্ত হয়ে উঠল; অংগপ্রত্যংগ জুড়ে অগণ্য চন্দ্রসূর্যের মেলা বসল; দেহকান্তি ঘিরে দেখা দিল সমুচ্চ পর্বতমালা, নদনদী এবং নানা দেশ-দেশান্তর; প্রকৃতির যাবতীয় শক্তি আশ্রয় নিল এই আশ্চর্যময় বালকে।

একটি কথাও না বলে, প্রার্থনাভরে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন রাণী। মুদিতনেত্রে তার পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে থাকলেন, তার শিশুরূপটি পুনর্ধারণ পর্যন্ত।

আমরা দেখেছি পশুদের মধ্যে অপত্যস্নেহ রয়েছে সরলভাবে। বাপ-মা তাদের সন্তানদের জন্ম থেকেই ভালোবাসে, স্বাস্থ্যে-অসুস্থতায় এবং বুদ্ধি-নির্বুদ্ধিতা সত্ত্বেও। বিশেষতঃ মায়ের আছে এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যাতে সন্তানের অন্তরাত্মার সদ্‌গুণাবলী ধরা পড়ে।

মানবজাতির কাছে পরিবার একটি অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস। এটি যথার্থই একটি সুখনীড়। কারণ, কাঠও নয় পাথরও নয়, তাঁবুর চট বা প্রাসাদের মর্মরও সুখনীড় রচনা করে না, বরং করে সেই ভালোবাসা যা কনিষ্ঠ থেকে জ্যেষ্ঠকে পরিবারের মধ্যে একত্রে রাখে এবং তাদের মিলিয়ে ধরে, যেমন কুক্কুটী তার ছানাদের নিজের ডানার তলায় সন্নিবদ্ধ রাখে।

*

* *

জনৈক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের অভ্যাস ছিল প্রতিদিন বন্ধুদের সংগে সাক্ষাতের আগে মায়ের চরণ আলিংগন করা।

একদিন তার আসার দেরী হওয়াতে বন্ধুরা কারণ জিজ্ঞাসা করল।

—“স্বর্গের নন্দনবনে সানন্দে দেরী করছিলাম,” তিনি বললেন, “কারণ, শুনেছি মায়ের চরণ ঘিরেই স্বর্গ বিরাজ করে।”

অল্‌-মোস্তাত্রাফের গ্রন্থেও লেখা আছে যে মুসা যখন ঈশ্বরের সংগে আলাপ করছিলেন তখন সেই মহাজন ৩৫০০ শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন।

আলাপান্তে মুসা বললেন, “হে আমার ঈশ্বর, প্রভু, আমাকে একটা ব্যবহার-সূত্র বলে দিন।”

ঈশ্বর উত্তর দিলেন:

—"তোমার মায়ের প্রতি নম্র থেকো, এই আমার আদেশ।"

এই কথাগুলি সাতবার উচ্চারিত হল এবং মুসা বললেন যে তিনি অবশ্য স্মরণ রাখবেন।

ঈশ্বর আরো বললেন:

—"হাঁ, মুসা, তোমার জননী যখন তোমার উপর সন্তুষ্ট তখন আমিও সন্তুষ্ট, এবং তিনি বিরক্ত হলে আমিও বিরক্ত।"

বাপ-মায়ের স্নেহ সন্তানের প্রতি মধুর বাক্যে ফুটে ওঠে।

এক আরব রমণী তার শিশুটিকে আদর করতে করতে বলছিল: "কৃপণ যেমন তার বিত্তকে ভালোবাসে একে আমি তেমনই ভালোবাসি।"

তাহলে পিতামাতার স্নেহ যদি সন্তানের দিকে ধায় তাহলে সন্তানের ভালোবাসা কি পিতামাতার দিকে যাবে না?

আমরা কি ভালোবাসার পরিবর্তে ভালোবাসা দেব না?

জগতে অসংখ্য ছেলেমেয়ে রয়েছে যারা তাদের পিতামাতাকে ভালোবাসায় ঘিরে রাখে এবং তাদের সেবা করে। ভারতবর্ষে লেখা যত কবিদের কাব্যগ্রন্থ তাদের সমষ্টির চেয়েও মোটা একখানা বই প্রয়োজন হবে ছেলেমেয়েরা বাপ-মায়ের প্রতি যে ভালোবাসা দেখিয়েছে তার সকল কীর্তি বর্ণনা করতে।

অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি তোমাদের কাছে বলব। গল্পটি প্রাচীন গ্রীসের।

বৃদ্ধ রাজা ইডিপাস ছিলেন অন্ধ। তিনি দেবতাদের বিরূপ করেছিলেন, তাই তাঁকে গ্রাম থেকে গ্রামে শহর থেকে শহরান্তরে ঘুরে বেড়াতে হত। সদয় লোকেরা তাঁকে আশ্রয় ও আহার্য দিত. কিন্তু কেউ দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারল না। কে তাঁকে নিয়ে যেত স্থান থেকে স্থানান্তরে? তাঁর মেয়ে আন্তিগোনি ছাড়া আর কে? পথে কোথায় পা ফেলতে হবে বলে দিত সে-ই; অপরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সে-ই বৃদ্ধের জন্য অনুকম্পা ভিক্ষা করত। সে-ই তাঁর সংবাদ-দূতী। আন্তিগোনি ক্ষণিকের জন্য অন্যত্র গেলে বৃদ্ধ ইডিপাস বিষণ্ণ হয়ে পড়তেন। সে ফিরে এলে তাঁর দারুণ আনন্দ: আবার এসে হাত ধরলে তিনি বলতেন:

—"যা-কিছু আমার কাছে মূল্যবান তা সব পেয়েছি। তুমি সঙ্গে থাকতে থাকতে যদি মরতে হয় তাহলে একটুও কাতর হব না।"

অবশেষে দেবতারা তাঁর প্রতি সদয় হলেন। তিনি অনুভব করলেন যে তাঁর মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত, কিন্তু মরণের পর তিনি যাবেন জ্যোতির্ময় পুরুষদের লোকে। অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের চেষ্টায়ই গেলেন এক উঁচু উঁচু পাথরে ঘেরা উপত্যকায়। সেখানে স্নান করে সুন্দর সুন্দর পোশাক পরলেন। তারপরেই শোনা গেল এক বজ্রধ্বনি। সবার দৃষ্টির সামনে বৃদ্ধ ইডিপাস

অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। তিনি হলেন মিলিত দেবতাদের সঙ্গে। তাঁর অন্তর্ধানের পর আন্তিগোনি কেঁদে বলল:

—"আহা, তাঁর সঙ্গে থাকা কালে দুঃখেও আমি ছিলাম সুখী, যা-কিছু ছিল অপছন্দের তাও হয়ে উঠত সুখকর যখন তিনি ছিলেন আমার কাছে কাছে।"

বস্তুত দুর্দশায় জীবন কাটাতে হয়েছিল তাঁকে, কিন্তু কন্যার ভালোবাসায় আশ্বস্ত না হলে তাঁর কষ্ট আরো কত বেশি হত!

*

* *

তোমাদের বললাম সন্তানের জন্য পিতামাতার ভালোবাসা, এবং পিতামাতার জন্য সন্তানের ভালোবাসার কথা। এখন কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, পরিবার কাদের নিয়ে গড়া—কী উত্তর দেবে?

সেদিন একটি বালককে ওই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সে উত্তর দিল: "দু'জনকে নিয়ে," সে বলতে চেয়েছিল স্বামী-স্ত্রী।

আর একটি বালককে জিজ্ঞাসা করতে সে উত্তর দিল "তিনজনকে নিয়ে," বাপ, মা ও সন্তানকে মনে রেখে।

অবশ্য আমরা জানি একটি পরিবার প্রায়শ তিনের অধিক লোক নিয়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক তারা চারজন : বাপ, মা ও দুটি সন্তান। এবার একটা নূতন চিন্তা, একটা নূতন মৈত্রী এসে দেখা দেয়, ভাই-বোনের বন্ধুত্ব। এই বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি থাকে না উপরের দিকে, যেমন পিতামাতার প্রতি, অথবা নিচের দিকে যেমন সন্তানদের প্রতি। আমরা এক্ষেত্রে প্রীতিবদ্ধ এমন এক বন্ধুর সঙ্গে যে আমাদের সমান স্তরে, সে এক রকমে আমাদেরই সমান, অথবা সমবয়স্ক। এই রকমে সহোদর-প্রেম গার্হস্থ্য-সম্পদে একটা নূতন সুর জুড়ে দেয়।

*

* *

পদ্মলোচনা স্ত্রী সীতাকে নিয়ে রাম যখন অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর ভাই লক্ষ্মণ সেই আনন্দের ভাগ নিলেন। আমোদোৎসবের জন্য তাঁবুর ভিড় বসে গেল; রাস্তায় রাস্তায় শোভা বাড়িয়ে আম-সুপুরি-কলাগাছ। ফুলে ফুলে আর বস্ত্রসম্ভারে ঝলমলে বাজার; পতাকা উড়ছে দিকে দিকে; ঢাকঢোলের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে; যাবতীয় গীতবাদ্য মিলেছে শ্রুতি-মধুর হয়ে; জনতা ধ্বনি তুলছে: "রাম, রাম!" রামের হৃদয় পরিতৃপ্ত। লক্ষ্মণের অন্তরও তা-ই। ভাই ভাইয়ের আনন্দের অংশ নিচ্ছেন।

তারপর একদিন এল যখন জীবনাকাশ মেঘাচ্ছন্ন, যেখানে সংগীতের

কোনো সুর শোনো যায় না। অযোধ্যার বৃদ্ধ রাজা জানালেন সেই নিষ্ঠুর আদেশ যার ফলে রামকে চতুর্দশ বছরের জন্য নির্বাসনে যেতে হবে।

লক্ষ্মণ যখন এই নির্মম আদেশ শুনলেন তখন যন্ত্রণায় বিকম্পিত হল তাঁর দেহ; নয়নে অশ্রু ভরে এল; তিনি ছুটে চললেন রামের পা জড়িয়ে ধরতে, ক্ষণকালের জন্য তাঁর বাক্‌শক্তি রহিত হল।

মহানুভব রাম বললেন, "ভাই, তোমার হৃদয় যেন বিচলিত না হয়। অন্তে সবই ভালো হবে। তুমি আমার সঙ্গে আসতে পারবে না। আমার বৃদ্ধ পিতা ও প্রজাদের সাহায্যের জন্য অযোধ্যায় থাকতে হবে তোমাকে।"

—"না," লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন, "না, দাদা, তা হয় না। আমি আপনার অনুষঙ্গী। আপনাকে সর্বান্তঃকরণে বলছি যে আপনি যেখানে যাবেন আমিও সেখানে সঙ্গে যাব।"

রাম অনুজকে তুলে ধরলেন, আলিঙ্গন করে বললেন:

—"যাও, তোমার জননীকে বিদায় জানিয়ে এস, তারপর আমার সঙ্গে চল অরণ্যে ও নির্বাসন যাত্রায়।"

লক্ষ্মণ আনন্দিত হলেন।

ভাই-বোনেরা পরস্পরকে রক্ষা করে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসবে হিন্দুঘরে বোনেরা ভাইদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দেয়, মণ্ডা-মিঠাই খেতে দেয়, এবং সামর্থ্য থাকলে জামাকাপড় উপহার দেয়। এইভাবে তারা মরণের দেবতা যমের আসার পথ বন্ধ করে। তাদের প্রার্থনা:

ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।

চন্দনকাঠ নয় কিন্তু ভালোবাসাই এখানে রক্ষা করে আশীর্বাদ দেয়, ভাইয়ের জন্য বোনের এবং বোনের জন্য ভাইয়ের ভালোবাসা।

*
* *

তবে পরিবারের সীমানাটা আমরা বাড়িয়ে দিতে পারি; সেখানে আসতে দিতে পারি প্রিয় পিতামহ-মাতামহদের, কাকা-জেঠা মাসি-পিসী এবং সম্পর্কিত ভাইদের।

আরো বাড়িয়ে দিতে পারি তাকে।

বলতে চাই সেই পুরুষ ও মেয়েদের কথা যারা পরিবারের একই রক্তের নয় অথচ যারা গৃহে সাহায্য করে ধোয়ামোছায় রান্নায় এবং আরো অনেক রকমে। বলতে চাই দাসদাসীদের কথা। তারাও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন রোমে একজন সম্ভ্রান্ত ধনী যখন তার পরিবারের কথা বলতেন তখন শুধু তাঁর এবং পুত্রকন্যাদের কথাই ভাবতেন না, তাঁর ক্রীতদাসরাও তার মধ্যে স্থান পেত।

পারস্যে মুসলমানদের উচ্চ-প্রশংসিত 'হাসান-হুসেন' নাটকের একটি দৃশ্য বর্ণনা করতে চাই।

ব্যাবিলোনিয়ায় কারবালার রণক্ষেত্রে নিহত হয়েছিলেন যে মহানুভব হুসেন, তিনি তখন শেষ যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। যুদ্ধে তাঁর সকল সঙ্গীরা মৃত। তিনি একাকী মরূদ্যানে শেষ তালগাছের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। পরিবারস্থ রমণীরা মৃতদের নিয়ে বিলাপরত, বিলাপ হুসেনকে নিয়েও যিনি শত্রুদের হাতে নিশ্চয় নিহত হবেন।

একের পর অন্যের কাছে তিনি বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন: নিজের স্ত্রী লায়লাকে; ভগ্নী জয়নাবকে; আর এক ভগ্নী কুলসমকে; আপন কন্যা রুকনিয়াকে।

এক নিগ্রো বৃদ্ধা বীর সেনাপতির কাছে এগিয়ে এল। "প্রভু," সে বলল, "আপনার সঙ্গে বিচ্ছেদের ভাবনায় আমার অন্তর কাতর। অতি বৃদ্ধা আমি, আমার আর বেঁচে থাকার অর্থ হয় না। শুধু একটি মনস্কামনা আছে: যা কিছু দোষ-ত্রুটি করেছি, দয়া করে ক্ষমা করবেন।"

বর্মাবৃত হুসেন, যিনি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কারবালার প্রান্তরে শহীদরূপে ভূতলশায়ী হবেন, স্নেহভরে তাকালেন নিগ্রো বৃদ্ধাটির দিকে এবং বললেন:

—"হাঁ, তুমি দীর্ঘকাল আমাদের সেবা করেছ। আমার মায়ের সংসার-যাঁতাকলে কাল-ক্ষয় করেছ। শস্যের দানা পিষেছ। আর কত-না আমাকে তোমার বাহুতে নিয়ে দোলা দিয়েছ! তোমার মুখখানা কালো, কিন্তু তোমার হৃদয় শুচিশুভ্রতা দিয়ে গড়া। আজ তোমাকে ছেড়ে যেতে চলেছি। আমার কাছে তোমার পাওনা অনেক ধন্যবাদ, কত যে তা গুণে বলতে পারি না। তোমার প্রতি অবিবেচনাসূচক এবং কঠোর কিছু করে থাকলে তার জন্য ক্ষমা চাইছি।"

*

* *

কিন্তু এখনো আমরা ধরতে পারিনি পরিবারের বৃত্ত কত বড় হবে। অন্য সেবক নেই কি, যারা দ্বিপাদ বা চতুষ্পদ, যারা সংসারের আনন্দ বর্ধন করে? নেই কি পাখিরা, যারা তাদের কিচিরমিচির ও গান দিয়ে আমাদের চিত্তবিনোদন করে? নেই কি গৃহপালিত পশুরা, যারা আমাদের ঘরে খেলা করে কিংবা খেতখামারে আমাদের কাজ করে? এই পশুরা, এই বশীভূত সাহায্যকারীরা, এরা কি গণ্য হবে না আমাদের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে?

সারা বিশ্ব জানে যে ভারতীয়রা তাদের একই দেশের অধিবাসী পশু-দেরও বন্ধু। কিন্তু আমাদের ভাই পশুদের সম্পর্কে এই দয়ালু মনোভাব শুধু তাদেরই একচেটিয়া নয়। উত্তরখণ্ডে যেখানে সমুদ্র পুরু বরফে পরি-

বর্তিত হয় এবং যেখানে মাটি প্রায় সর্বদা বরফে সাদা সেখানে একজাতের লোক থাকে যাদের নাম এস্কিমো।

একদা এই দেশে একটা সাদা ভালুক বা মেরু-ভালুক তিন জন লোকের প্রাণ রক্ষা করেছিল। সমুদ্রে পতিত তাদের কামড়ে ধরেছিল ভালুকটি, সাঁতার কেটে টেনে তুলেছিল পাড়ে। তারা তখন অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং ঋণ শোধে উৎসুক দেখাল।

"ধন্যবাদ," বলল ভালুকটি, "আপাততঃ আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে যদি কখনো অন্যদের সঙ্গে আপনারাও আমাকে তাড়া করে ধরে ফেলেন তখন দয়া করে অপরদের বলবেন কি আমার প্রাণ না নিতে? আমার নগ্ন মস্তক দেখেই চিনবেন।"

বলেই সে ঝাঁপ দিল সমুদ্রে এবং সাঁতার কেটে পালিয়ে গেল।

পরের বছর শীতকালে ওই দলেরই এস্কিমোরা বরফের উপর একটি ভালুককে দেখতে পেয়ে তাড়া করল। শিকারীদের মধ্যে ওই তিনজন লোকও ছিল যাদের প্রাণ টাক-মাথা ভালুকটি বাঁচিয়েছিল। তারা চিনল এই সেই ভালুকটি। তারা বন্ধুদের ডেকে ওকে রেহাই দিতে বলল। শুধু তাই নয়, এক চমৎকার খানা তৈরি করে তার সামনে বরফের উপর সাজিয়ে দিল। ভালুক পেট ভরে খেয়ে নিদ্রার জন্য বরফের উপর সটান শুয়ে পড়ল; কেউ তার অনিষ্ট করল না এবং ছোটরা নির্ভয়ে তার চারপাশে খেলা করতে লাগল। ঘুম থেকে উঠে সে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেল, ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জলে এবং সাঁতার কেটে চলে গেল। এস্কিমোরা আর কখনো তাকে দেখতে পায়নি, তবে চিরদিন তারা মনে রেখেছে তাদের ভালুক-বন্ধুকে।

*

* *

তাহলে পরিবারের ধারণায় আমরা অন্তর্ভুক্ত করব: পিতা, মাতা, সন্তান, ভাই, বোন, পিতামহদের, ভৃত্যকুল, মানুষের সেবক পশুদেরও।

এ তো জানাই কথা যে বিশ্বের সব দেশে পরিবারের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার এক নয়। তোমাদের কাছে চিত্তাকর্ষক লাগবে ভ্রমণের সাহায্যে, বই পড়ে কিংবা শিক্ষকদের কাছ থেকে জানতে জাপানে চীনে পারস্যে মিশরে য়ুরোপে আমেরিকায় পরিবারের ধরন-ধারণ কী; দেখতে পাবে অনেক পার্থক্য। কিন্তু সর্বত্র হৃদয়ে রাজত্ব করছে ভালোবাসা, এবং স্নেহই সেখানে মূল নীতি। এমন হতে পারে যে কোনো এক পরিবারের লোকেরা পরস্পরকে ভালোবাসে না; তাকে অবশ্য সত্যকার পরিবার বলা চলে না।

একজন মানুষের ধরনধারণ অমানুষের মত হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে সে তো আর সত্যকার একজন মানুষ নয়।

রঙ্গনাথ ও তাঁর পিতা

১৮৩১ সালে বারো বছরের জনৈক ভারতীয় চিত্তুর জেলার এক জজ-সাহেবের দরজায় গিয়ে করাঘাত করল। সে যে কৃষকের পুত্র, খাজনা দিতে না পারায় তার জেল হয়েছে। কৃষক কিছু সরকারী জমি নিয়েছিল, কিন্তু ফসল হয়নি এবং প্রচলিত আইন অনুসারে তাকে জেলে যেতেই হল।

জেলবাসকালে পিতাটির জন্মদিন এল, মা কাঁদতে লাগল কর্তা বাড়িতে উপস্থিত থাকতে পারবে না বলে। এই জন্যই রঙ্গনাথ ছুটে গিয়েছিল চিত্তুরে এবং বিচারকের দুয়ারে গিয়ে করাঘাত করেছিল।

জজসাহেব বালকের কাহিনী শুনে বললেন:

—"তোমার বাবাকে আমি তো ছেড়ে দিতে পারি না যতক্ষণ না প্রতিশ্রুতি পাচ্ছি যে ফিরে এসে সে জেলের মেয়াদ কাটাবে।"

—"আমাদের টাকাপয়সা নেই," বালক উত্তর দিল, "কিন্তু নিজে আমিই হব জামিন, বাবার বদলে আমিই থাকব জেলে।"

জজসাহেবের হৃদয় স্পর্শ করল। তিনি পিতার মুক্তির হুকুম সই করলেন। হরিণের মতো রঙ্গনাথ দ্রুত ছুটে গেল জেলে। পিতাপুত্র সানন্দে বাড়ির দিকে রওনা হল এবং রাত্তিরে গিয়ে সেখানে পৌঁছল।

রঙ্গনাথ পরে রঙ্গনাথ শাস্ত্রী বলে সুপরিচিত হয়েছিলেন। তিনি পনেরটি ভাষায় লিখতে ও বলতে পারতেন।

সাদা হাতি

একটা দুর্ধর্ষ সাদা হাতির নেতৃত্বে—দলের সকলে যাকে রাজা বলে মানতে গর্ব বোধ করত—৮০ হাজার হাতির এক পাল হিমালয়ের জঙ্গলে চরে বেড়াচ্ছিল।

রাজার মা ছিল অন্ধ।

অরণ্যের দূর দূর অঞ্চলে দল নিয়ে ঘুরলেও তার মা'র জন্য কিন্তু মমত্ব-পূর্ণ চিন্তা থাকতই এবং তাকে দূত মারফত নানারকম ফল পাঠাত।

হায়! দূতরা নিজেরাই সে সমস্ত ফল খেয়ে ফেলত, আদরের এসব উপহার অন্ধ মায়ের কাছে পৌঁছত না। বঞ্চনা ধরতে পেরে রাজা স্থির করল সে দল ছেড়ে দেবে ও নিজে মায়ের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তখন মা'কে সে নিয়ে এল একটা হ্রদের পাড়ে কান্দরণ পাহাড়ের এক গুহায় এবং দু'জনে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

একদিন বারাণসী শহরের একটি লোক সে জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলল এবং দলবিচ্ছিন্ন হয়ে সাতদিন ধরে ঘুরপাক খেল।

গজরাজ নতজানু হয়ে বিভ্রান্ত মানুষটিকে তার পিঠে উঠতে আমন্ত্রণ জানাল, পরে বারাণসী যাবার পথে গিয়ে তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিল।

হায়! মানুষটির হৃদয় কুটিল। সে বারাণসীর রাজাকে বলল, কি অপূর্ব শ্বেত হস্তী পাওয়া যায় কান্দরণের গুহায়; আর রাজাও তাকে বহু অনুচর দিয়ে পাঠাল সেই রাজকীয় হাতিটি ধরতে। অনুসরণকারীরা দেখতে পেল সেই শুভ্র হাতিটি হ্রদের জলে দাঁড়িয়ে আছে। তারা তাকে বেঁধে ফেলল, কিন্তু সে-ও বাধা দিল না; তারা তাকে বারাণসীতে নিয়ে এল।

ছেলে ফিরে এল না দেখে অন্ধ মা বিষাদমগ্ন হল।

—"আঃ," দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল তার, "চন্দনগাছ বেড়েই চলেছে, তেমনি কুটজ, তৃণমঞ্জরী, করবী, পদ্ম আর নীলফুল, কিন্তু আমার বাছা, কোথায় সে?"

সাদা হাতির ফুলভারে সুশোভিত এক খোঁয়াড়ে স্থান হল, রাজা নিজে এলেন তাকে খাওয়াতে। কিন্তু হাতির তাতে কিছুমাত্র স্পৃহা নেই।

—"আমার মা তো এখানে নেই," সে বলল।

—"নাও, নাও," আবেদনের সুরে বারাণসীরাজ বললেন, "বন্ধুর মতো খেয়ে নাও।"

—"আহা, বেচারী অন্ধ কান্দরণের গুহায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে।"

—"কার কথা বলছ?" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

—"আমার মা আমার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন।"

রাজা তখন হুকুম দিলেন হাতিকে ছেড়ে দিতে, বিরাট পশুটিও শহর থেকে জঙ্গলের দিকে চলে গেল; পুষ্করিণী থেকে কিছু জল নিয়ে ছুটল সে গুহায়, অন্ধ মাকে সেই স্নিগ্ধ ধারায় অভিসিঞ্চিত করে দিল।

মা বলে উঠল :

—"বৃষ্টি পড়ছে! হায়, ছেলে এখানে নেই যে আমার যত্ন নেবে।"

—"মা," বলে উঠল সে, "এই তো আমি তোমার ছেলে, রাজা আমাকে ফেরত পাঠিয়েছেন।"

তখন দুজনে সুখী।

মা মারা গেলে তার দাহকার্য হল, এবং যথাকালে সাদা হাতিটিও মারা গেল। রাজা তার আকৃতি অনুসারে এক পাথরের প্রতিমূর্তি গড়ালেন এবং ভারতবর্ষের সকল প্রান্ত থেকে লোকের ভিড় প্রতি বছর এসে এই গজোৎসবে যোগ দেয়।

সহানুভূতি

বিষাদের সাথী হয়ে বিষাদ কখন আসে?

যখন কোন হৃদয় তা অনুভব করে এবং আমাদের হৃদয়ও তা একই সময় অনুভব করে।

প্রসিদ্ধ যোদ্ধা দুর্যোধন কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে ধরাশায়ী হলেন এবং তাঁর বন্ধুরা এত কাতর হলেন যে যখন তিনি শায়িত ও মৃত তখন সারা প্রকৃতি মনে হল বিপর্যস্ত। বহু হাত-পা বিশিষ্ট নানা কবন্ধ পৃথিবীর ওপর ভয়ংকর নৃত্য শুরু করল। হ্রদ ও কুয়োর জল শোণিতাক্ত হয়ে উঠল। নদীর জল না নেমে তার উৎসে বেয়ে উঠল। পুরুষের আকৃতি রূপ নিল নারীর এবং নারীর আকৃতি পুরুষের।

কবি আমাদের এখানে বলতে চাইছেন যে একটি মানুষের অনুভূত যন্ত্রণা ছড়িয়ে যায় বিপুলা পৃথ্বীর ওপর। নিহত রাজা ও লক্ষ লক্ষ জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে সহানুভূতির যোগ ছিল।

এই সহানুভূতি কি শুধু যন্ত্রণার মধ্যেই ফুটে ওঠে? না, তা যেমন দুঃখের মধ্যে তেমনি আনন্দের মধ্যেও দেখা দেয়।

শোনো হরিণশিশু নান্দীয়র গল্প; সে তার পিতামাতার সঙ্গে শান্তির দিনেও যেমন অন্ধকার দুর্দিনেও তেমনি প্রেমময় ছিল।

যে বনে কোশলরাজ প্রায়ই মৃগয়ায় যেতেন সেখানেই নান্দীয় তার বাপ-মায়ের সঙ্গে পারস্পরিক প্রেম ও শান্তিতে বসবাস করছিল। যখন তিনি মৃগয়ায় বেরুতেন তখন রাজ্যের বহুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতেন, বহু কোশলবাসীকে তাঁর সেবক ও ভৃত্যরূপে তাঁর অনুসরণ করতে হত; এতে বহুলোকের কাজের ব্যাঘাত হত এবং ফলে যে লোকসান তাদের সহ্য করতে হত তা নিয়ে গুঞ্জন উঠত।

ফলত লোহার শিক ও কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা পার্ক তৈরি হল—তার মাঝখানে একটা পুকুর, তখন সকলে জঙ্গলে গেল যত হরিণ তাড়িয়ে সেই পার্কে নিয়ে আসতে, যাতে রাজা মৃগয়ার জীব হাতের মুঠোর মধ্যে পান এবং তাঁকে আর বিরাট দলবল নিয়ে শিকারে ছুটতে না হয়।

লাঠি হাতে জনতাকে আসতে দেখল নান্দীয়। একটা ছোট ঝোপে বাপ-মা'র সঙ্গে ঘাস খাচ্ছিল সে।

—"দাঁড়াও এখানে," বাবা-মাকে বলল সে, "ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি আমি।"

একলা বেরিয়ে এল সে, লোকেরাও ঝোপের মধ্যে আর জানোয়ার নেই ভেবে তাকে নিয়ে এল বাইরে।

ঝোপের মধ্যে যে দুটি হরিণ ছিল তাদের ছাড়া অন্য সবাইকে রাখা হল

পার্কে। রাজা সন্তুষ্ট, প্রয়োজন মতো দলের কাউকে তিনি তীর-ধনুক দিয়ে শিকার করতেন। নান্দীয়র পালা আসতে অনেক সময় কেটে গেল।

শেষমেষ যখন সে-সময় এল, নান্দীয় তখন রাজার সামনে নিশ্চল হয়ে দাঁড়াল, আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টা না করে।

এরকম অনভ্যস্ত ব্যবহার দেখে রাজা এত বিস্মিত যে তীর আর ছুঁড়লেন না। ধনুক নামিয়ে তিনি অপেক্ষা করলেন।

—"ছুঁড়ুন, মহারাজ," নান্দীয় বলল।

—"পারছি না। হরিণ শাবক, তোমার মধ্যে সৎ পদার্থ আছে। তোমার জীবন ফিরিয়ে দিলাম।"

—"মহারাজ, এই পার্কে বাকি যত হরিণ আছে তাদের ছেড়ে দেবেন না?"

—"রাজী হলাম।"

—"রাজন, আপনার অনুগ্রহ কি আকাশে পাখিদের উপর এবং জলে মাছের উপর বর্ষণ করবেন না?"

—"রাজী হলাম।"

পুরাকাহিনী বলছে এই হরিণটি হলেন বুদ্ধদেব; তিনিই বললেন রাজাকে, তাঁকে শেখালেন জীবে দয়ার রীতি। রাজা তারপর এক দূত পাঠালেন রাজ্যের সর্বত্র ঢাক পিটিয়ে জানাতে যে তাঁর রক্ষণাদেশ থাকল হরিণ-পাখি-মাছেদের জন্যে।

তোমরা অক্লেশে বুঝেছ পিতামাতাকে বাঁচিয়ে নান্দীয় ঠিকই করেছে। ভাইবোনদের সাহায্য করাও ভালই হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী গল্পে দেখতে পাবে এক আরব রাজপুরুষ কেমন একজনকে সত্যকার ভাই না হলেও ভাই ডেকেই কথা বলছেন।

এক যাত্রীদল মরু পার হচ্ছিল, তখন জলের ঘাটতি দেখা দিল। আরব যাত্রীরা বাধ্য হল জল মেপে নিতে যাতে প্রত্যেকে অল্প এবং সমান ভাগ পায়।

একটা পেয়ালায় পাথরকুচি রেখে তারা মাপছিল। অন্য পেয়ালা থেকে জল ঢালা হত যতক্ষণ না পাথরটি ডুবে যায়। প্রত্যেকের জন্য এইটিই মাত্রা।

শুধু দলের প্রধান ব্যক্তিরাই জলের অংশভাগী ছিলেন।

এমনিভাবে প্রথমবার জলের ভাগ মাপা হল। কাব-ইবু-নামা যখন পেয়ালা মুখে দেবেন এমন সময় দেখলেন নমিরের উপজাতির একজন সতৃষ্ণ নয়নে তা দেখছে। কাব পরিবেশককে বললেন, নমিরের লোকটিকে দেখিয়ে :

"আমার ভাগ এই ভাইকে দাও।"

লোকটি ঢক ঢক করে গিলল। কাব জল পেলেন না।

পরের দিন আবার জল বণ্টনের সময় এল।

এবারও নমিরের লোকটি সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইল। যাকে তিনি 'ভাই' বলেছিলেন তাকে আবার নিজের পেয়ালাটি দিলেন।

কিন্তু দলের যখন যাত্রার সময় এল তখন কাবের উটের পিঠে উঠবারও শক্তি নেই।

বালির উপর চিৎপাত পড়ে থাকলেন তিনি।

অন্যরা আর দাঁড়াতে সাহস পেল না, ভয় যে শেষে সবাই তৃষ্ণায় মারা যাবে। তাকে শিকারী পশুর হাত থেকে রক্ষার জন্য চাদর-ঢাকা দিয়ে সেখানে মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে চলে গেল তারা।

*

* *

লক্ষ্য করে থাকবে দুঃখ যখন অনুভূত হয়, তখন তা প্রতিবেশীর অন্তরেও দ্রুত ছড়িয়ে যায়। যখন দুর্যোধনের পতন হল, অচিরে প্রকৃতিই ক্লিষ্ট হয়ে পড়ল। যখন বাপমায়ের বিপদ আসন্ন তখন নান্দীয় তাদের রক্ষায় এগিয়ে এল। নমিরের লোকটা যখন তৃষ্ণার্তভাবে তাকাল তৎক্ষণাৎ মহৎ আরব সর্দার তাঁর জল দিয়ে দিলেন।

বিষাদ দ্রুত বিষাদের অনুসরণ করে, আনন্দ আনন্দের সহগামী হয়।

সহানুভূতি যখন দেরিতে আসে তখন তাকে আর আমরা তত মূল্যবান মনে করি না।

প্রসিদ্ধ কবি ফিরদৌসি পারস্যরাজের ইতিহাস লিখেছিলেন এবং তা সুলতান মামুদকে শুনিয়েছিলেন; সুলতান মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং কিছু-কালের জন্য কবিকে বিশেষ অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন। শাহ্‌-নামা কাব্য তিরিশ বছর পরিশ্রমের ফল, এবং সুলতান তাঁকে রচনা শেষে ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

সুলতানের মন্ত্রী ফিরদৌসিকে কুনজরে দেখতেন। এই ব্যক্তি মনিবকে বোঝালেন সম্পদটি একান্ত নিম্নমূল্যের এবং সুবুদ্ধির কাজ হবে কবিকে সোনার বদলে রূপা দেওয়া। মামুদ এই পরামর্শ গ্রহণ করলেন ও ফিরদৌসিকে কয়েক বস্তা বোঝাই ষাট হাজার রৌপ্যমুদ্রা পাঠালেন।

যখন বস্তাগুলি এল তখন ফিরদৌসি স্নানরত। সুলতানের গৃধ্নুতায় তিনি এত ক্রুদ্ধ হলেন যে উপহার গ্রহণ করতেও অনিচ্ছুক। কুড়ি হাজার মুদ্রা তিনি মুদ্রাবাহককে দিলেন, কুড়ি হাজার স্নানঘরের মালিককে এবং আর কুড়ি হাজার জনৈক পাথরের ব্যবসায়ীকে যে সেই সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল।

মামুদকে এই অপমানের কথা জানান হলে তিনি হুকুম দিলেন তাকে হাতির পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলা হোক। ফিরদৌসি খবর পেয়ে এক দূর গণ্ডগ্রামে পালিয়ে গেলেন; শেষে তার জন্মস্থান তুস নগরে আস্তানা গাড়লেন।

সুলতান ফিরদৌসিকে এমন হীনভাবে লাঞ্ছিত করার জন্য অচিরে অনুতপ্ত হলেন এবং কবির শ্রদ্ধা পুনরর্জনের জন্য আগ্রহী হলেন। তুস নগরে তিনি

এক দূত পাঠালেন অসংখ্য উপহার সহ ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা, অঢেল রেশম মসলিন কিংখাব মখমল......

হায়! উপহার পৌঁছল অতি বিলম্বে।

যখন রাজদূতটি শহরের এক তোরণ পার হচ্ছে উষ্ট্রশ্রেণীর পিঠে মামুদের সেই মহার্ঘ উপহার বয়ে তখন আর এক তোরণ দিয়ে মৃতের শান্তিধামে চলেছে কবির নশ্বরদেহ বহন করে কফিনটা।

*

* *

"আমাদের সম্রাট ন্যায়পরায়ণ," বলত চীনের লোকেরা, "কারণ গরীবদের নালিশ শুনতে তাঁর কান সর্বদা প্রস্তুত।"

কিন্তু একদিন এল যখন সে-কান শুনতে অপারগ। রাজা হঠাৎ বধির হলেন। পাখিদের গান, মলয়ের মর্মর, মানুষের কণ্ঠ আর তিনি শুনতে পান না।

রাজা কেঁদে ফেললেন; রাজ-অমাত্য এবং কর্মচারীরা যাঁরা সভায় সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা ইঙ্গিতে এবং লিখে জানালেন সান্ত্বনা, অনুরোধ করলেন এত মর্মাহত না হতে।

—"ভাববেন না" তাঁদের তিনি বললেন, "নিজের জন্য কিংবা এই অসামর্থ্য-প্রসূত দুশ্চিন্তায় বিমর্ষ আমি। আমি দুঃখিত এই জন্য যে এখন আর্তদের প্রার্থনা আর শুনতে পাব না।"

সব নিস্তব্ধ, কারণ কেউ জানে না কী করে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া যায়।

—"আহা!" হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন তিনি, "একটা উপায় খুঁজে পেয়েছি। সব প্রজাদের জানিয়ে দাও কেউ লাল পোশাক পরবে না, শুধু আমার সাহায্য যাদের দরকার তারা ছাড়া। তখন কোনো পুরুষ বা মহিলাকে লাল পোশাকে দেখলেই জানব তা আমার প্রতি আবেদন, আমার বধির শ্রবণ তা শুনবে, আর তৎপর হব আর্তকে সাহায্য দিতে।"

সহৃদয় সম্রাট বধির হলেও তাঁর কাজ বন্ধ করেননি। অভাবগ্রস্ত এবং গরীবদের খুঁজে বের করার এক অভিনব পন্থা ক্রমে তিনি পেয়েছিলেন। এই মহান মানুষটি শোকতাপ তাঁর সামনে উপস্থিত হবার অপেক্ষায় থাকেননি—চেষ্টিত হয়েছিলেন তিনি পন্থা আবিষ্কার করতে।

*

* *

কিছুসংখ্যক ভারতীয় সংকর্ম সাধনের উদ্দেশ্যে একত্র হয়ে 'দেবসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একটি মাসিক পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল :

পেশোয়ার থেকে : দুটি মহিলা দৈনিক দু'ঘণ্টা ধরে নারী ও শিশুদের

ভারতীয় ভাষা শেখান। পুরুষেরা রোগীদের বাড়িতে কিংবা হাসপাতালে নিয়ে সেবা করেন, গো-পালন করেন এবং রাস্তা থেকে ভাঙা কাচের টুকরো তুলে নেন।

মোগা থেকে : দু'জন মহিলা মেয়েদের হিন্দী শেখান। পুরুষরা পশু-পালন এবং বৃক্ষরোপণ করেন। সমাজের জনৈক সভ্য এক গরীব শ্রমিককে বিনামূল্যে শিক্ষা দেন।

ফিরোজপুর থেকে : আটজন মহিলা রোগীর সেবা করছেন। ছেলেরা যত বুড়ো অথর্ব গরুর যত্ন করছে, অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে এবং গাছে জল দিচ্ছে। অন্য একজন সভ্য গাড়ীর ধাক্কায় জখম হয়ে রাস্তায় পতিত জনৈক নির্বান্ধবকে দেখতে পেয়ে তাকে নিয়ে হাসপাতালে দিয়েছে। আর এক সভ্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে গরীব অন্ত্যজদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা দিচ্ছে।

শিয়ালকোট থেকে : একজন বিধবা মহিলা আর-একজন একমাত্র পুত্রহারা বিধবার সঙ্গে দেখা করেন, তাকে জ্ঞান দেন, সান্ত্বনাবাণী শোনান।

লক্ষ্য করে থাকবে যে কয়েক ক্ষেত্রে হৃদয়বত্তা শিক্ষাদানের রূপ নিয়েছে। যারা শিক্ষা দেয় তাদের হৃদয় অজ্ঞানের প্রতি করুণায় পূর্ণ; আর একজনের জ্ঞান প্রয়োজন, তাকে দিতে সে প্রস্তুত। আর রুটি জল বা বেশবাসের মতো জ্ঞানও হল এমন উপহার যা মানুষ মানুষকে দিতে পারে।

*

*　*

শিকারে সমর্থ ও সুদক্ষ ছিলেন রাম, শিক্ষাদানের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন সমর্থ ও সুদক্ষ। জঙ্গলে মৃগয়ায় বের হতেন যখন তখন সঙ্গে নিতেন কোনো ভাইকে বন্ধুর মতোই। যখন তিনি খেতে বসতেন বা ঘুমোতেন তখন তাঁর তরুণ ভাই পাশে বসে, যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য পাহারা দিত। এই বীর পুরুষটি যখন শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য গুরুগৃহে গেলেন তখন তিনি চতুর্বেদ আয়ত্ত করলেন তেমন সহজে যেমন অন্যরা ক্রীড়াকৌতুক বা গান শেখে। বেদ ও পুরাণে নিজের মন সমৃদ্ধ করে তিনি আদৌ চাইলেন না সেই পবিত্র বাণী সব নিজের হৃদয়ের গুপ্তস্থানে রাখতে। তিনি সে জ্ঞান দিলেন তাঁর ভাইকে।

হৃদয়বত্তা যেমন অপরকে ভালো জ্ঞানের অংশ দিতে চায়, তেমনি মিলে-মিশে সুসংবাদও ভোগ করতে চায়। উদাহরণ, অপরকে আনন্দ দিতে পেরে কতই-না আনন্দ হনুমানের। শোনো—

প্রভু রামচন্দ্রের মহৎ ভাই ভরত অযোধ্যা থেকে রামের নির্বাসন কালে চতুর্দশ বছর ধরে অপেক্ষা করেছিলেন। পরমসুন্দর রাম বনে অরণ্যে ঘুরেছেন, এবং যুদ্ধের বিপর্যয়েও পড়ে গিয়েছেন। ভরত কিন্তু জানতেন না অগ্রজের

কী অবস্থা। চতুর্দশ বছরের শেষ যখন সন্নিকট তখন তিনি বিষাদে আচ্ছন্ন, তাঁর মনে হল রামের শ্রীমুখ আর দেখতে পাবেন না, কারণ তাঁর কোনো খবরই তো তিনি পাননি।

আর একটি দিন, আর চতুর্দশ বৎসরের শেষ।

ভরত বসে আছেন কুশাসনের উপর, তাঁর কেশ জটাবন্ধ, কৃশ দেহ, আক্ষেপভরে মনে মনে বলছিলেন তিনি :

"হে রাম, রাম, রঘুপতি!"

সেই সময় বানররাজ হনুমান সম্মুখে উপস্থিত, যে হনুমান এত বিশ্বস্তভাবে যুদ্ধে বীর রামচন্দ্রের সেবা করেছেন।

তিনি এনেছেন সুসংবাদ, তা এনে এতই খুশি যে তাতে তাঁর চোখ অশ্রুপরিপূর্ণ, এবং ভরতের দুঃখ আনন্দে পরিবর্তিত করতে পেরে তিনি অন্তরে অনুভব করলেন বিশ্ববিশাল আনন্দ। তিনি বললেন :

"যাঁর জন্য আপনি দিনরাত্রি কাতর তিনি এসেছেন, সুস্থ ও নিরাপদ। যুদ্ধে শত্রু দমন করে, নিজের প্রতি দেবতাদের প্রশস্তি শুনে প্রভু এখন সীতাদেবী এবং অনুজসহ প্রত্যাবর্তনের পথে।"

ভরত তাঁর পুরানো দুঃখ আর মনে আনলেন না :

"কে তুমি এমন সুসংবাদ আমাকে দিলে?"

"আমি হনুমান, পবননন্দন, যদ্যপি বানর তবু রঘুপতি রামের সেবক।"

ভরত হনুমানকে আলিঙ্গন করলেন।

—"সে কথা আরো বলো" বললেন তিনি, "হাঁ, সব খুলে বলো।"

হনুমান তাঁকে সব শোনালেন,—সুসংবাদের দূত হতে পারায়, এতদিন ধরে কাতর ভরতের শোকার্ত আননে প্রাণের পুনরাবির্ভাবে তাঁর আনন্দ বর্ণনাতীত।

*

* *

শুধু কি মানুষের মধ্যেই মানবহৃদয় করুণা প্রকাশ করে? না, পশুর কষ্টেও সে কষ্ট বোধ করে, তার আনন্দে আনন্দ।

লোকেরা ঘৃণাভরে জনৈক মহিলার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, তাকে বলা হচ্ছিল পাপী।

এই পাপিনী দেখতে পেল তৃষ্ণায় দারুণ কাতর একটি কুকুর। মুমূর্ষু জীবটি। বিনা নালিশে বেচারা আবেদন জানাল একটু পানীয় জলের জন্য।

পাপী রমণী তার জুতো খুলে কাছেই একটি কুয়োর মধ্যে তা নামিয়ে দিল; এই রকমে একটুখানি জল তুলে কুকুরটাকে দিল, এতে তার জীবন রক্ষা হল।

তার সম্বন্ধে লোকেরা মত বদলে ফেলল।
"ঈশ্বর এই রমণীর পাপ ক্ষমা করেছেন," তারা বলল।
হয়তো সে পাপী ছিল কিন্তু মানবতার মর্ম সে বুঝত।

*

* *

আরো এই একটি:

একটি লোক পয়গম্বর মহম্মদের কাছে এল, তাঁকে দেখাল এক টুকরো কাপড়ে জড়ানো কচি ছানা সহ একটা পাখির বাসা।

—"এই পাখিদের পেয়েছি, হে প্রভু, যখন আমি বন পার হচ্ছিলাম," সে বলল। "ছানাদের কিচিরমিচির শুনে একটা গাছে নজর করে দেখি এই পাখির বাসা।"

"মাটিতে রাখ ওই বাসাটি," বললেন মহম্মদ।

মা-পাখিটি তখন ডানা ঝটপট করে উড়ে এসে বাসার কাছে দাঁড়াল, ছানাদের ফিরে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা।

—"যাও, যেখান থেকে এনেছ সেখানে রেখে এস এদের সবাইকে," বললেন মহম্মদ। আরো যোগ করলেন তিনি:

"পশুদের প্রতি সদয় থেকো। তাদের পিঠে উঠো যখন তারা তোমাকে বহনে বেশ শক্তসমর্থ। তারা ক্লান্ত হলে নেমে প'ড়ো। তৃষ্ণায় তাদের জল খেতে দিও।"

ইসলামের ইতিবৃত্তে বলেছে, একদিন পরীরা ভগবানকে বলল:

—"হে ভগবান! পৃথিবীতে শিলাখণ্ডের চেয়েও শক্ত কিছু কি আছে?

—"হাঁ," ভগবান উত্তর দিলেন, "লোহা বেশি শক্ত, কারণ তা পাথর ভেঙে ফেলে।"

—"লোহার চেয়েও শক্তিমান কিছু কি আছে?"

—"হাঁ, আগুন, কারণ তা লোহাকে গলিয়ে দেয়।"

—"আর আগুনের চেয়েও শক্তিমান কিছু কি আছে?"

—"জল, কারণ তা আগুন নিভিয়ে ফেলে।"

—"আর জলের চেয়েও শক্তিমান কী?"

—"বায়ু, কারণ তা জলকে তরঙ্গচঞ্চল করে তোলে।"

—"আর তার চেয়েও শক্তিমান কিছু আছে কী?"

—"হাঁ, সদয় হৃদয় যে গোপনে ভিক্ষা দেয়, ডান হাত কী করছে বাঁ হাতকে তা জানতে না দিয়ে।"

তবে বর্তমানে ভিক্ষাদানই সদয় হবার প্রধান উপায় নয়। প্রতিবেশীকে সদন্তঃকরণের সঙ্গে একটা কিছু দিয়ে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু গল্পটির

বক্তব্য হল যে এই দানের বা অন্য সব উপায়ের মধ্যে সহৃদয়তার শক্তি সবচেয়ে শক্তিমান বিশ্বে অপরের স্নেহ ও বন্ধুত্ব অর্জনে।

অন্যের দুঃখে দুঃখ জাগে, আনন্দ জাগে আনন্দে।
সহানুভূতির মহান প্রকৃতিই হল এই রকম।

সমাপ্ত

ISBN 81-7058-096-X

Rs. 8.00